গীতা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ

ড. সুদীপ বসু

গীতা উপনিষদেরই ভাষ্য। গীতার বিষয়বস্তু আত্মতত্ত্ব। গীতা যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখন কর্ম ও জ্ঞানমার্গীয় সন্ন্যাসী ও দার্শনিকদের মধ্যে বিরোধ ছিল। জ্ঞানমার্গে যাঁরা বিশ্বাস করতেন তাঁরা মনে করতেন, আত্মজ্ঞান লাভই মোক্ষ বা মুক্তির একমাত্র পথ। গীতাকার তাঁর নিষ্কাম কর্মের মহান বাণী ও আদর্শ প্রচার করে পরস্পর বিরোধী দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের অবসান ঘটালেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও ঋষি অরবিন্দের ভাবাদর্শে গীতার প্রভাব এবং তাঁদের এ বিষয়ক চিন্তার একটি তুলনামূলক আলোচনা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ, আলমবাজার মঠে থাকাকালীন সতীর্থদের সঙ্গে, কখনও বা যুবক শিষ্যদের সঙ্গে গীতার বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের ৪২তম অধিবেশনে বিবেকানন্দ নিষ্কাম কর্ম সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেছেন, সেখানে গীতার প্রসঙ্গ এসেছে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তিনি যে একাধিক বক্তৃতা করেন, সেগুলিতেও গীতার শ্লোক উল্লেখ করেছেন বারংবার— গীতার বিষয়গুলিকে সহজসাধ্য করে তুলে ধরেছেন।

মানুষই যে অনন্তশক্তির আধার সে যে সর্বশক্তিমান— সেকথা বিবেকানন্দ বারংবার বলেছেন। তাঁর প্রিয় একটি শ্লোক হলো :

'সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ / বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।। সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্। / ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্' (গীতা ১৩।২৭-২৮)

'বিনাশশীল সর্বভূতের মধ্যে অবিনাশী— পরমেশ্বরকে যিনি সমভাবে অবস্থিত দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন; কারণ ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি নিজেকে হিংসা করেন না, সুতরাং পরমগতি প্রাপ্ত হন' (বাণী ও রচনা, ৫ম সংস্করণ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮২-৮৩)। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে কর্মযোগের শিক্ষা দিয়েছেন সেটি বিবেকানন্দকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমরা যেসব কাজ প্রতিনিয়ত করি— তার প্রত্যেকটিই যে শুভ ফল দেয়, তা তো নয়— সবই শুভাশুভমিশ্র। আগুনের তেজ ও দীপ্তি সত্য। কিন্তু তার চারপাশে যে ধোঁয়া সেটিও কিন্তু মিথ্যা নয়। কাজেই এমন কোনও শুভ কর্ম থাকে না, যেখানে অশুভের সামান্য স্পর্শ নেই। কিন্তু সেজন্য কাজ বন্ধ থাকা উচিত নয়। বিবেকানন্দের মতে, আমাদের এমন কাজে নিযুক্ত থাকা উচিত, যার দ্বারা অধিক পরিমাণে শুভ এবং অল্প পরিমাণে অশুভ হয়। খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন, 'অর্জুন ভীষ্ম ও দ্রোণকে বধ করিয়াছিলেন। ইহা না করিলে দুর্যোধনকে পরাভূত করা সম্ভব হইত না। অশুভ শক্তি শুভ শক্তির উপর প্রাধান্য লাভ করিত এবং দেশে এক মহাবিপর্যয় আসিত। একদল গর্বিত অসৎ নৃপতি বলপূর্বক দেশের শাসনভার অধিকার করিত এবং প্রজাদের চরম দুর্দশা উপস্থিত হইত।' (বাণী ও রচনা / ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৭-৬৮)।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মে সানফ্রান্সিস্কোতে একটি বক্তৃতা দিতে গিয়ে জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন বিবেকানন্দ। অবশ্যম্ভাবীরূপে কর্মযোগের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন যে, জ্ঞানই যদি জীবনের উচ্চতম অবস্থা হয়, তবে কর্মকে কেন তিনি অগ্রাধিকার দিচ্ছেন? গীতাকে অনুসরণ করে বড় চমৎকার করে বললেন বিবেকানন্দ যে প্রকৃতির গুণগুলিই আমাদের বাধ্য করে কাজ করতে। গীতার ৩/১ সংখ্যক শ্লোককে অনুসরণ করে বিবেকানন্দ বুঝিয়ে বললেন, যে মানুষটি বাইরের কাজ বন্ধ করে মনে মনে কাজের চিন্তা করেন, সেই বিষয়ে ভাবেন— স্বভাবতই কোনও কিছুই তিনি লাভ করতে পারেন না। কিন্তু যে মানুষ মনের শক্তি দিয়ে ইন্দ্রিয়গুলিকে ধীরে ধীরে বশীভূত করে কাজ করে চলেন, তিনি আগের জনের থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই কাজই একমাত্র পন্থা। নিজের জীবন দিয়ে বিবেকানন্দ তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। জোরের সঙ্গে তিনি বলতে পেরেছেন— 'শ্রীকৃষ্ণ সব কাজই করেছিলেন, কিন্তু আসক্তিবর্জিত হয়ে। তিনি সংসারে ছিলেন বটে, কিন্তু কখনওই সংসারের হয়ে যাননি। সকল কাজ করো, কিন্তু অনাসক্ত হয়ে করো; কাজের জন্যই কাজ করো, কখনও নিজের জন্য করো না।' (বাণী ও রচনা / ৫ম সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১৭)।

বিবেকানন্দ মনে করতেন, গীতা হলো উচ্চতর জীবন সংগ্রামের এক অপূর্ব রূপক। পার্থিব জগতের বিপন্নতা, দুঃখ, ক্লেশ প্রতিনিয়ত আমাদের খর্ব করে, যন্ত্রণামলিন করে। এটাই খুব স্বাভাবিক। চাওয়া ও পাওয়া সমবিন্দুস্থ না হলে আমরা হতাশ হই— বিষাদভারাতুর হই। বিবেকানন্দ বলছেন, অধ্যায়ের পর অধ্যায় ধরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উদ্দীপিত করে চলেছেন— যাতে তিনি যুদ্ধবিমুখ না হন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, বিষণ্ণতাকে জয় করতে, মৃত্যুভয় ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কলকাতাবাসী কয়েকজন যুবক শিষ্যকে বিবেকানন্দ গীতা ও বেদান্ত চর্চার কথা বলতেন, নিজেও ব্যাখ্যা করতেন। আলমবাজার মঠে বাস করার সময় প্রায়ই এই কর্মযোগ নিয়ে আলোচনা করতেন তিনি। তাঁর মতে, সমগ্র বেদান্ত দর্শনই গীতায় নিবদ্ধ। খুব সুন্দর করে বলেছেন, 'এই মহৎ কাব্যগ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্যরত্নরাজির চূড়ামণি রূপে পরিগণিত। ইহা বেদের ভাষ্যস্বরূপ। গীতা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতেছেন, এই জীবনেই আধ্যাত্মিক সংগ্রামে আমাদের জয়ী হইতে হবে। সংগ্রামে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিয়া সবটুকু প্রাপ্য আদায় করিতে হইবে। গীতা উচ্চতর জীবনসংগ্রামের রূপক, তাই যুদ্ধক্ষেত্রেই গীতা বর্ণনার স্থান নির্ণীত হওয়ায় অতি উচ্চাঙ্গের কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।' (বাণী ও রচনা, ৫ম সংস্করণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৭)।

এই যে নিষ্কাম কর্ম, এই যে অনাসক্তি— তা আমাদের আনন্দে রাখবে। আমরা যখন উপলব্ধি করবো যে, অন্যের জন্য কাজ নয়— নিজের জন্য করছি, কাজ করছি কাজের জন্য, তখন কাজের মধ্যে যে বন্ধন থাকে, ক্লেশ থাকে তা সরে যায়। এই অনাসক্তি অর্জন করা যখনই সম্ভব হয়, তখনই মানুষের উত্তরণ ঘটে। তুচ্ছ হয়ে যায় বিষয়বাসনা। বিবেকানন্দ বারংবার বলেছেন, অপরের জন্য কাজ করে করে নিজেকে নিঃশেষ করে দেবার কথা।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মে সানফ্রান্সিস্কোতে আয়োজিত এক সভায় বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন, গীতায় কীভাবে পরমতসহিষ্ণুতার কথা বলা হয়েছে। সাধনপথ-সাধনক্রম ভিন্ন হলেও গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাকে গুরুত্ব না দিয়ে লক্ষ্যের প্রতি মনোনিবেশ করতে নির্দেশ করেছেন। 'প্রত্যেকে মনে করেন, তাঁহার পথই শ্রেষ্ঠ পথ। খুব ভালো। কিন্তু মনে রাখিবেন— ইহা আপনার পক্ষেই ভালো হইতে পারে। একই খাদ্য যাহা একজনের পক্ষে দুষ্পাচ্য, অপরের পক্ষে তাহা সুপাচ্য। যেহেতু ইহা আপনার পক্ষে ভালো, অতএব আপনার পদ্ধতিই প্রত্যেকের অবলম্বনীয়— সহসা এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন না। জ্যাকের কোট সবসময় জন বা মেরির গায়ে নাও লাগিতে পারে।' (বাণী ও রচনা, ৫ম সংস্করণ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৪১১)। তাই যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি অন্যের দুর্বলতা দেখে তাকে মন্দ বলবেন না কখনও, বরং তার স্তরে নেমে গিয়ে তাকে সাহায্য করে যাবেন যতদূর সম্ভব।

স্বামী বিবেকানন্দ স্বার্থরহিত নিষ্কাম কর্মের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং সেই কাজ 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়'।

এর বাস্তবায়নেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠা। নিষ্কাম কর্মকে পরম সত্য ঘোষণা করেও সতর্ক করেছেন বিবেকানন্দ। নিষ্কাম কর্ম অর্থে সুখ বা দুঃখ— কোনওটিই মন স্পর্শ করে না, এটা নয়— তা হলে দস্যুবৃত্তি করার সময় সুখ বা দুঃখের কোনও অনুভূতি যদি কোনও দুরাচারীর মনে না জাগে, তবে সে নিষ্কাম কর্ম করছে এটা বলা যাবে না। অহং শূন্য হয়ে কাজ করার কথা গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— বিবেকানন্দ সেই কর্মের কথাই বলেছেন—। সেই কর্মেই জগতের মঙ্গলবিধান সম্ভবপর।

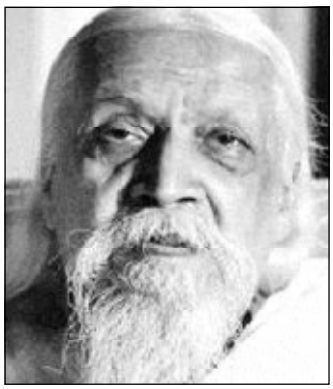

বিবেকানন্দের মতোই শ্রীঅরবিন্দও বাসুদেব কৃষ্ণকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন সাধনপথে— 'বাসুদেবঃ সর্বম্' (গীতা ৭/১৯) (দিব্য জীবন, ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ৩৮৯) শ্রীঅরবিন্দ গীতাকে 'The Divine Teacher' বলেছেন (The complete works of Sri Aurobindo, Vol.19, 1992 ed. Page12)।

তাঁর মতে, মহাভারতের যে বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহ— বহু ঘাত-প্রতিঘাত, সেখানে কৃষ্ণ কখনোই 'Hero' রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি— অথচ, সব ঘটনার নিয়ন্ত্রী তিনিই— অর্জুনের সমস্ত শক্তির উৎসব সেই বাসুদেব কৃষ্ণ। এবং কৃষ্ণের শক্তি-বীর্যবত্তার সবটুকু নিয়োজিত বৃহত্তর মঙ্গলকামনায়। সেখানে তাঁর নিজের ব্যক্তিসুখ চরিতার্থের প্রশ্ন নেই, নেই অর্জুনের লক্ষ্য পূরণের অভিলাষ— সবটাই সংঘটিত মহাভারতের সংগঠনে। কৃষ্ণ সেই 'hidden guide'. (Essays on Gita. Complete works of Sri Aurobindo, Vol. 19, 1992)। যে অজ্ঞানতা, যে অহংবোধ নিয়ে আমরা চালিত— সেসব বিচূর্ণ হয় কৃষ্ণের এই স্বার্থরহিত কর্মসম্পাদন প্রত্যক্ষ করলে। আমাদের মধ্যে যে কর্মস্পৃহা যা আত্মসুখ রহিত তাই কৃষ্ণ। খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তিনি, বুঝিয়ে বলছেন কীভাবে আমাদের অস্তিত্বে, তা যত সামান্যই হোক না কেন, তা কীভাবে উন্নততর লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে কর্মের ব্যাপ্তিতে— কৃষ্ণকে তিনি সেই ত্যাগের সম্রাট বলেছেন— সেই ত্যাগ যা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে বৃহত্তর মানবতাকেই গুরুত্ব দেয় এবং তাকেই 'এক' বলে গণ্য করে। The Divive Teacher' প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন, 'The Teacher of the Gita is therefore not only the God in man who unveils himself in the word of knowledge but the God in man who moves out whole world of Action, by and for whom all our humanity exists and struggles and labours towards whom all human life travels and progresses. He is the secret master of works and sacrifice and the friend of the human people.' (The Divine Teacher : Essays on Gita. Complete works of Sri Aurobindo. Vol. 19, 1992)।

জগতে আছে একটি বিশ্ববিধান— তেমনি আছেন তার নিয়ন্ত্রক। জীব আছে নিজের উপস্থিতিকে আঁকড়ে ধরে, জীব চলেছে তার আশু প্রয়োজনের কক্ষপথটিকে প্রদক্ষিণ করতে করতে। শ্রী অরবিন্দ দেখিয়েছেন জীব যখন তার ব্যক্তিগত সীমাসংহতিকে অতিক্রম করে যেতে সমর্থ হয়, তখনই তার মধ্যে বিশ্বমানবতার প্রকাশ লক্ষিত হয়। এই যে অতিক্রমী শক্তি বা মানসিকতা সে একটি আদর্শে স্থিত থাকে। সেই আদর্শ অন্ন-বস্ত্রের মতো প্রয়োজনীয় বিষয় ঘনিষ্ঠ নয়। সেই আদর্শে আছে এক অবিচ্ছিন্ন আন্তরিকতার বোধ। সেই বোধ জাগলেই মানুষ পারবে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে।

'ভবানীমন্দির' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর আত্মোপলব্ধির কথা জানাতে গিয়ে বলেছেন যে, সর্বভূতে শক্তিরূপে তিনিই অর্থাৎ সেই পরমশক্তিমান বিশ্বম্ভর পুরুষই অধিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে জীবাত্মার ঐক্য বিধানের মধ্যেই আছে সৌন্দর্য। আজকের যেসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার— আমরা তার মধ্যেও তো শক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করে থাকি। কিন্তু 'বিজ্ঞানের শক্তি রাক্ষসের হাতে ভীমসেনের গদার মতো। দুর্বলতার জন্য সে তা তুলতে পারে না, তার চাপে নিজেই মারা পড়ে।' (The Life of Sri Aurobindo - A. B. Purani, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1964, P-75)। খুব সুন্দর ভাবে তিনি প্রাকৃত জগতের বিজ্ঞান ও বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রীশক্তি সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞানের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন এই প্রবন্ধে।

শ্রীঅরবিন্দ গীতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মনের কথা বলেছেন। মানুষ মনোময়। সেই মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, মনোময় রাজ্যের মানুষকেই হতে হবে বুদ্ধ, প্রবুদ্ধ এবং সম্বুদ্ধ। অতিমানস অধিমানসের স্তরে যাবে মানুষের মন, যা স্থূল বাসনা কামনায় আবদ্ধ। গীতায় সেই কামনা-বাসনা অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিকে দূরে

সরাবার কথাই প্রকাশিত। যে 'Spirit' মানুষের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তাকে স্বাধীন হতে হবে— এই স্বাধীনতা তো কোনও রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক নয়, এর প্রকৃতি ভিন্ন— 'It will be vigilant to illuminate them so that they may grow into the light and law of the spirit, not by supervision and restriction, but by a self searching, self controlled expansion and a many sided finding of their greatest, highest and deepest potentialities, for all these are potentialities of the spirit.' (Sri Aurobindo, Vol. XV, 1971, P-170)। নিষ্কাম বা স্বার্থশূন্য হলেই আলোক প্রাপ্ত মন ঊর্ধ্বতর মানস (higher mind), বিভাসিত মন (illuminated mind) ছাড়িয়ে অধিমানসের (Overmind) রূপরেখা অতিক্রম করে উপনীত হবে অতিমানসের (Supermind) জগতে। কর্মবন্ধন কেটে যাবে তখনই। শ্রীকৃষ্ণের যে কর্ম, তা সম্ভব হয়েছিল নিজের মনকে বশীভূত করতে সমর্থ হবার কারণেই।

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ — এঁরা দুজনেই পাশ্চাত্যের শিক্ষা ভাবাদর্শকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বেদান্ত ও উপনিষদের ঐতিহ্য তাঁদের বোধ ও বোধিকে প্রদীপ্ত করেছে। আলিপুর জেলে ধ্যানমগ্ন শ্রীঅরবিন্দের কাছে সূক্ষ্ম শরীরে বিবেকানন্দের আত্মপ্রকাশ ও যোগ সাধনার সহায় হবার কথা। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন— 'Vivekananda came and gave me the knowledge of intuitive mentality'. (Life of Sri Aurobindo, A.B. Purani, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 1964, P-213)।

বিবেকানন্দ প্রায়োগিক বেদান্তের কথা বলেছেন। গীতা প্রসঙ্গেও তাঁর চিন্তাধারা একই— নিষ্কাম কর্মের সঙ্গে সমাজ হিতৈষণার দিকটি বারংবার প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর চিঠিপত্র, বক্তৃতাদিতে। সোচ্চারে তিনি ঘোষণা করেছেন— 'যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি।' (বাণী ও রচনা / ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯২)

শ্রীঅরবিন্দ জীবনের সূচনালগ্নে পরাধীন ভারতবর্ষের শৃঙ্খলামুক্তিতে তৎপর হয়েছিলেন বহু সংখ্যক মানুষের হিতকল্পে, সেকথা ঠিক। কিন্তু সেই কর্মযজ্ঞ তাঁর জীবনে শেষপর্যন্ত রক্ষিত হয়নি। প্রবাহিত হয়ে গেছে একটি ভিন্ন খাতে। অন্তরাত্মার পরম প্রকাশ তিনি লক্ষ্য করেছেন পূর্ণ যোগের মাধ্যমে। সৃষ্টির পরিণাম সেই চৈতন্যের মুক্তিতে অভিব্যক্ত।

শ্রীঅরবিন্দের মতো বিবেকানন্দও আত্মশক্তির উদ্বোধনের কথা বারংবার বলেছেন— অরবিন্দ বিবর্তনের স্তরের কথা বলেছেন— আত্মশক্তিতে উদ্বোধিত হওয়া সম্ভব সেই বিবর্তনের স্তরগুলিকে জেনে ও বুঝে।

শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে গীতার নিষ্কাম তত্ত্ব বিবেকানন্দের আদর্শের ভাবভূমি রচনা করেছিল। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মেলবন্ধনে যে অনন্তরূপকে অধিগত করা সম্ভব, কামনারহিত হওয়া সম্ভবপর তার পন্থা নির্দেশ করতে গিয়ে বিবেকানন্দ চারটি পন্থার কথা বলেছেন— জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও রাজযোগ। মানুষকে অজ্ঞানতা বা স্বল্পজ্ঞানের স্তর থেকে যেতে হবে উন্নততর জ্ঞানলোকে। শ্রীকৃষ্ণের মতোই বিবেকানন্দও বলছেন অন্তঃস্থিত জ্ঞান ও শক্তির কথা। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেও বলেছেন, আমাদের মন বুদ্ধি একেবারে নতুন নয়— আমাদের শক্তি আমাদের মধ্যেই নিহিত। অন্তঃশায়ী সেই শক্তির উদ্ঘাটনেই আমরা আমাদের মানসিক বিন্যাসের পরিমার্জন ঘটাতে পারবো। মনকে সেই জ্ঞান ও বোধের কাছে উপনীত করার কথাই বলেছেন বিবেকানন্দ। বিপরীতে, শ্রীঅরবিন্দ অজ্ঞানতাকে (Ignorance) জ্ঞানের অভাব বলেননি কোনওভাবেই। তাঁর মতে, অজ্ঞানতাও জ্ঞানের একটি রূপ (form)। এই অজ্ঞানতাই supermind -এর স্তরে গেলে উন্নত মনের অধিকারী হওয়া সম্ভব।

বিবেকানন্দ অদ্বৈত দর্শনে প্রত্যয়ী— গীতার তত্ত্বদর্শন অনুসরণ করেও অরবিন্দ পূর্ণ অদ্বৈতবাদে (Integral Dualism) প্রত্যয়ী।

বিবেকানন্দ মনে করতেন, মানুষ স্বভাবতই পূর্ণ। সেই পূর্ণতার পরিস্ফূরণ ঘটাতে চেয়েছেন তিনি, যেভাবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আস্থিত করেছেন নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে। অন্যদিকে অরবিন্দ মনে করতেন, ঊর্ধ্বায়িত যা পূর্ণতা লাভের আগে মন নির্দিষ্ট কিছু স্তরে প্রস্তুতির অবকাশ রাখে।

কিন্তু উভয়েই মনে করতেন, ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের বিভ্রান্ত করে। গীতায় (২/২৬) কৃষ্ণ যে বলেছেন যা চিরকাল আছে, (সৎ) তা নেই— এটা কখনোই সম্ভবপর নয়; আবার যা কখনোই নেই (অসৎ), তা আছে— সেটিও সম্ভবপর নয়। বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিন্দ দু'জনেই মনে করতেন যা কিছু এই সমগ্র বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে আছে, তা আদি অন্তহীন ও অবিনাশী। এই দেহের আদি ও অন্ত আছে, কিন্তু যিনি দেহের মধ্যে বাস করেন তিনি অনাদি ও অবিনশ্বর— তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

আধুনিক ভারতে বিজ্ঞান গবেষণা-বিস্তৃতির প্রয়াসে নিবেদিতার ভূমিকা

দেবীপ্রসাদ রায়

নিবেদিতা আধুনিক ভারতে জগদীশচন্দ্র বসু প্রবর্তিত বিজ্ঞান গবেষণার পথকে সুগম ও অর্থবহ করে তুলতে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। পরাধীন ভারতে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান গবেষণার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে করতে তিনি ও জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান জগতের বিচিত্র দিগন্তগুলিকে দৃশ্যমান করে তুলেছিলেন। তাকে বজায় রাখতে এবং সম্প্রসারিত করতে স্বামীজী আবিষ্কৃত ও পরে দীক্ষিত নিবেদিতার অসামান্য ভূমিকার স্মরণ ও মনন আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখার কৃতিত্বে স্বাক্ষর রেখে চলা ভারতের এক জাতীয় কর্তব্য। যুগ যুগান্ত সঞ্চিত কুসংস্কারে দীর্ণ, নিজের বিপুল ঐতিহ্য ও পরম্পরা-বিস্মৃত, তন্দ্রাচ্ছন্ন এক জাতিকে জাগ্রত করতে আধ্যাত্মিক শক্তির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক শক্তির উন্মেষ চাই—স্বামী বিবেকানন্দ এটা বুঝেছিলেন। পাশ্চাত্য জগৎকে আধ্যাত্মিক শক্তির সন্ধান দেওয়া ও পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক প্রাপ্তিগুলিকে আত্মস্থ করে দীন-দরিদ্র জাতির বৈষয়িক উন্নতি ত্বরান্বিত করার যুগ্ম প্রয়োজনেই স্বামীজী আমেরিকা গেছিলেন। প্রথম ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেই স্বামীজী অধীর হয়ে উঠেছিলেন দেশে বৈজ্ঞানিক চর্চার সুষ্ঠু বাতাবরণ তৈরি করার উদ্যোগ নিতে। কারণ ওই পথেই অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হবে সাধারণ ভারতবাসীর। পরিব্রাজক হিসেবে ভারত ভ্রমণের সময় দীন-দরিদ্র ভারতবাসীর সংস্পর্শে এসে সম্যকভাবে বুঝেছিলেন 'এক মুঠো ছাতু খেতে পেলেই এরা জগত উল্টে দিতে পারে', আর এই জগৎ ওল্টানো কাজটাই তো তাঁকে এদের দিয়ে করাতে হবে।

এই খোঁজাটাই স্বামীজীর সামনে এনে দিল ইংলন্ড ভ্রমণকালে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলকে ১৮৯৫ সালে। মার্গারেট নোবল স্বামীজীর বক্তৃতায়, বক্তব্যের আন্তরিকতায়, দৃঢ়তায়, আস্থা উৎপাদনের ক্ষমতায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে স্বামীজীকে তাঁর গুরু বলে ভাবতে

শুরু করলেন। সেই সময়কার ভারতবর্ষের সার্বিক প্রয়োজন বুঝতে এবং তদনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত হতে এই বিদুষী ভয়হীন মহিলাকে স্বামীজীও চিনতে ভুল করেননি। তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রয়োজনে, সেখানকার শত দুঃখ কষ্ট ঝুঁকি সব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ জানানোর পরও এই মার্গারেট নোবল ভারতবর্ষে যেতেই মনস্থ করলেন। ভাবের ঘোরে কোনও অলীক কল্পনার শিকার না হয়ে কাজ করার ব্রতে ব্রতী হওয়ার জন্য স্বামীজীর সাবধানবাণীকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করেই মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল ১৮৯৮ সালের এক বৃষ্টি-ঝঞ্ঝামুখর প্রাতে মোম্বাসা নামক জাহাজে রওনা হয়ে কলকাতা এসে পৌঁছলেন ২৮ জানুয়ারি। স্বামীজী স্বয়ং তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। ২২ ফেব্রুয়ারি স্বামীজী তাঁকে নিয়ে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনকক্ষে, স্বামীজীর তীর্থক্ষেত্রে এবং বিশ্বমানবতাবোধ উন্মেষের পীঠস্থানে। দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে পরিচিতি ঘটনানোর জন্য স্বামীজী ১১ মার্চ, তাঁর সভাপতিত্বে স্টার থিয়েটারে নোবলের এক বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ইংলন্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক প্রভাব'। অসাধারণ সাফল্য পেলেন, অভিনন্দিত হলেন বিপুলভাবে। ১৭ই মার্চ শ্রীশ্রীমা'র সঙ্গে মার্গারেট নোবলের সাক্ষাৎকার হলো। সবাইকে অবাক করে শ্রীমা নোবলকে আপন করে নিলেন। ২৫ মার্চ স্বামীজী দীক্ষা দিলেন মার্গারেট নোবলকে। নাম দিলেন নিবেদিতা। পরবর্তীকালে ভারতের ভগিনী নিবেদিতা। গুরু-শিষ্য পরম্পরার ইতিহাসে এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কারণ এই নামকরণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিবেকানন্দের এক সাফল্যমণ্ডিত এবং সাফল্যবহনকারী নামকরণ।

দীক্ষা নেবার পরই নিবেদিতা চাইলেন শিক্ষিত প্রগতিশীল ব্রাহ্মসমাজে একটা প্রবেশপথ পেতে, স্বামীজী প্রকল্পিত লক্ষ্যে পৌঁছতেই। তিনি জানতে পেরেছিলেন স্টার থিয়েটারের সভায় জগদীশচন্দ্রের উপস্থিতির কথা। জগদীশচন্দ্র, ড: প্রসন্নকুমার রায়, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ ব্রাহ্ম ব্যক্তিত্বের এবং তরুণ ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের জন্য নানা পরিকল্পনা মাথায় খেলত তাঁর। ১৮৯৯ সালে বিবেকানন্দও নিবেদিতাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন 'Make inroads into the Brahmos'। ব্রাহ্মরা বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শর প্রবল সমালোচক-বিরোধী ছিলেন প্রায় সবাই। এর মধ্যে জগদীশচন্দ্রর সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ তাঁর আগেই ঘটেছিল ১৮৯৮ সালের প্রথম দিকে। তবে ব্রাহ্ম হিসেবে নয়, ইউরোপে হুলস্থূল ফেলে দেওয়া বিজ্ঞানী হিসেবে। ভারতীয় বিজ্ঞানী হিসেবে, প্রেসিডেন্সি কলেজ কম মাইনে দেওয়ার প্রতিবাদে বেতন না নেওয়া। গবেষণাগারের ন্যূনতম সুবিধা না দেওয়াতে মাত্রাতিরিক্ত ক্লাসের বোঝা চাপানো, গবেষণার সময় না দেওয়া— এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মাইক্রোওয়েভ সৃজন, প্রেরণ এবং গ্রহণের

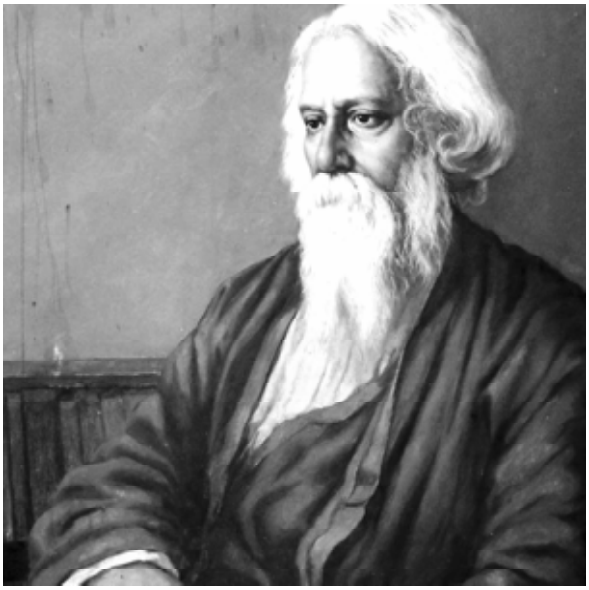

নিজ নির্মিত যন্ত্রাদির সাহায্যে যে চাঞ্চল্যকর সাফল্য পেয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র তাঁর খবর ইংলন্ডেও এসে পৌঁছায়। র‍্যালে, লর্ড কেলভিন প্রমুখের প্রশংসা, তাঁর কার্যকলাপ নিবেদিতার কাছেও পৌঁছায় লন্ডনের বিখ্যাত সিমেস ক্লাবের সেক্রেটারি হিসেবে। ততদিনে স্বামীজীর সান্নিধ্যে এসে ভারতীয়ত্বকে গ্রহণ করতে উন্মুখ ছিলেন নিবেদিতা। সুতরাং ভারতে এসে সেই জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে শ্রদ্ধামিশ্রিত কৌতূহল তো থাকবেই। নিবেদিতা সারা বুলকে নিয়ে জগদীশচন্দ্র বসুর ল্যাবরেটরিতে এসেছিলেন। স্বামীজীর কাছ থেকে নবলব্ধ অদ্বৈত তত্ত্ব ও বিজ্ঞান নিয়ে তাঁর প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র তাতেই উদ্দীপ্ত নিবেদিতার মন আকর্ষিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের প্রশ্নে বিবেকানন্দের সঙ্গে তীব্র মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও বিবেকানন্দও যেমন, নিবেদিতাও তেমন ভারতের প্রয়োজনে জগদীশচন্দ্রের ভারতীয় দর্শন আধারিত বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে আন্তরিক সহযোগিতা করেছিলেন। বসুর মতো একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে শোচনীয় অবস্থার মধ্যে কাজ করতে দেখে নিবেদিতা ক্ষোভে দুঃখে মর্মাহত হতেন। নিজ জাতির সভ্যতার বড়াই যেন তাকে ব্যঙ্গ করত। ১৮ এপ্রিল ১৯০৩, তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, "The College routine was made as orduous as possible for him, so that he could not have the time he needed for investigation and every little thing that happened was made an excuse for irritating correspondence and flags misrepresentation."

নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য পরিকল্পনা করতে লাগলেন। অর্থাভাবে পীড়িত জগদীশচন্দ্রকে তিনি সন্ত্রান্ত

প্রতিপত্তিশালিনী মহিলা স্বামীজী-শিষ্যা সারা বুলের সঙ্গে পরিচিত করানোর উদ্যোগ নিলেন। সারা বুল ছিলেন বিখ্যাত বেহালাবাদক ওলি বুলের বিধবা পত্নী। সারা বুলকে নিবেদিতা জানালেন, ভারতীয় বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ প্রয়োজন। আবার জগদীশচন্দ্রকে বললেন, 'তুমি তাঁকে চিঠি লিখে তোমার কাজের কথা, আশা আকাঙ্ক্ষার কথা জানাও। কিছু লুকিও না। তিনি তোমার প্রতীক্ষায় আছেন, একটু সাড়া পেলেই তিনি তোমার পাশে দাঁড়াবেন। তোমার শক্তিতে তাঁর আস্থা আছে।'

সৌজন্যে : বোস ইন্সটিটিউট

ঠিক সেটাই হয়েছিল। ১৯০৪ সালে সারা বুল এবং নিবেদিতার চেষ্টায় জগদীশচন্দ্র রাজি হলেন তাঁর 'গ্যালিনা ক্রিস্টাল ডিটেক্টর'-এর পেটেন্ট নিতে। বসু পেটেন্ট নেবার বিরোধী ছিলেন খুব— মানুষের জ্ঞানকে নিয়ে ব্যবসা করতে তিনি রাজি ছিলেন না। তাই এর বাস্তব প্রয়োজন বুঝে বিবেকানন্দ বসুকে অনুরোধ করলেও বসু রাজি হননি। কিন্তু সারা বুল ও নিবেদিতার ঐকান্তিক প্রয়াসে তা সম্ভব হয়েছিল। জগদীশচন্দ্রের গবেষণা প্রবন্ধগুলি যথাযোগ্য স্থানে যথাযোগ্য সময়ে প্রকাশিত হতে পারছিল না আর্থিক কারণ ছাড়াও কিছু সংকীর্ণচিত্ত ইউরোপীয় বিজ্ঞানীর জন্য। তাই নিবেদিতা এক দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন। জগদীশচন্দ্রের গবেষণালব্ধ ফলগুলিকে লিখিত রূপে দিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে আগ্রহী হলেন। আয়ারল্যান্ডের বুদ্ধিদীপ্ত এলিট সমাজে এক সময়ে তাঁর বৌদ্ধিক আদান-প্রদানের অভিজ্ঞতায় বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকাটা কোনওভাবেই তাঁর আগ্রহকে অবদমিত করতে পারেনি। বরং যে মুন্সিয়ানায় তিনি সেগুলি করেছিলেন তা ভারতের সার্বিক উন্নয়নপ্রয়াসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কোনও একটি দিকও তাঁর সচেতন সংযুক্তি থেকে দূরে থাকেনি। অবশ্য মাঝে মাঝে একটা অপরাধবোধ তাঁকে পীড়া দিত। স্বামীজীর একসময়ে কাঙ্ক্ষিত ও প্রকাশিত ইচ্ছে যে, রামকৃষ্ণভাব আন্দোলনের সঙ্গে নিবেদিতার যুক্ত থাকা, তা ব্যাহত হচ্ছিল। ১৮৯৯ সালের ১৮ এপ্রিল স্বামীজীর সঙ্গে দুপুরের আহারের সময় নিবেদিতা তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বর কথা ব্যক্ত করলে স্বামীজী বলে ওঠেন, "You just keep as you are"। নিবেদিতা আশ্বস্ত হলেন এটা জেনে যে, ভারতে বিজ্ঞানচর্চাকে সাহায্য করাটা ভারতীয়ত্ববোধ জাগ্রত করারই অঙ্গ। নিবেদিতাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল স্বামীজীর আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি— ''আমার উদ্দেশ্য রামকৃষ্ণ নয়; বেদান্ত নয়, আমার উদ্দেশ্য সাধারণের মধ্যে মনুষ্যত্ব আনা।''

২৫ জুন, ১৮৯৯, স্বামীজী আমেরিকায় দ্বিতীয়বারের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। এবার নিবেদিতাও সঙ্গী হলেন। উদ্দেশ্য তাঁর বাগবাজার স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহ। জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে বেশ কিছুদিনের জন্য সম্পর্করহিত হলেন। কিন্তু একটা ঘটনা ঘটল, প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ও সম্মেলনের সংগঠক Patric Geddes তাঁর সেক্রেটারি হওয়ার জন্য নিবেদিতাকে আহ্বান জানান। এই আহ্বান নিবেদিতার বৌদ্ধিক অবস্থানের স্বীকৃত মান নির্দেশ করে। নিবেদিতা কিন্তু সম্মেলনের আগেই ভারতে ফিরতে মনস্থ করে তাঁর অপারগতার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সম্মেলনের ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ ফিজিসিস্ট-এ জগদীশচন্দ্র বসু এবং ইতিহাস ও ধর্ম শাখায় স্বামীজীর আমন্ত্রণ থাকায় শুভানুধ্যায়ীদের পীড়াপীড়িতে সেক্রেটারি হতে রাজি হন। জগদীশচন্দ্র বসুর বক্তৃতা ও প্রদর্শনীর অসাধারণ সাফল্যে চমৎকৃত স্বামীজীর সেই উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, ''..এ মহাকেন্দ্রের ভেরিধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদতরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। ... সমগ্র বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশচন্দ্র বসু— ভারতবাসী, বঙ্গবাসী ধন্য বীর।''

সেপ্টেম্বর ১৯০০, ব্রডকাস্ট ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে প্যারিস বক্তৃতারই অনুরূপ একটি বক্তৃতা দেন জগদীশচন্দ্র বসু। এরপরই তিনি গুরুতর অসুস্থ হন। নিবেদিতা ও মিসেস বুল এই সময় আগলে রেখেছিলেন বসু-দম্পতিকে। বসুর বৈজ্ঞানিক পেপারের অনুবাদের সঙ্গে আর একটি গুরুতর আশ্চর্য কাজ নিবেদিতার উপর বর্তায়, তা হলো রবীন্দ্র সাহিত্যের অংশবিশেষ ইংরেজি অনুবাদ। বেরিয়ে এল ইংরেজিতে অনূদিত রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্প। বসুর বিজ্ঞান প্রকল্পগুলির উপস্থাপন এবং রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুবাদ দুই-ই সমানে চলেছিল দিনরাত এক করে। বসু ১০ মে ১৯০১ সালে ইংলন্ডের রয়্যাল ইন্সটিটিউশনে জীব ও জড়ের ঐক্য সেতু সংক্রান্ত গবেষণা পত্রটি পেশ করেন। নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন। সেই সভার আনুপূর্বিক বিরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র

With Best Compliments from-

A
Well
Wisher

(NG)

With Best Compliments from-

TANTIA CONSTRUCTIONS LTD.

Registered & Corporate Office
DD-30, Sector -I,
Salt Lake City, 7th Floor
Kolkata - 700 064
Tel. : +91 33 4019 0000
Fax : +91 33 4019 0001

Delhi Office :
112, Uday Park, 2nd Floor
August Kranti Marg
New Delhi - 110049
Tel. : 011-40581302

Best Compliments from-

ELGA PAINTS & POLYMERS

Manufacturer of

Quality Paints & Ancillaries

30D, Diamond Harbour Road
Kolkata - 700060
Phone : 033 2406 2431

দিয়েছিলেন নিবেদিতা, তার বঙ্গানুবাদ-নির্ভর একটি রচনা 'আচার্য জগদীশের জয়বার্তা' নামে 'বঙ্গদর্শনে' লেখেন রবীন্দ্রনাথ। এই প্রবন্ধ জানিয়ে দেয় কী পরিমাণ শ্রদ্ধায় বসুর বক্তৃতা বর্ণিত হয়েছিল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে সে চিঠির অংশ বিশেষ : ''মাঝে মাঝে তাঁহার (বসুর) পদবিন্যাস গাম্ভীর্যে এবং সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকিল। মাঝে মাঝে তিনি সহাস্য সুনিপুণ পরিহাস সহকারে অত্যন্ত উজ্জ্বল সরল ভাবে বৈজ্ঞানিক ব্যূহের মধ্যে অস্ত্রের পর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি রসায়ন, পদার্থতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা প্রশাখার ভেদ অত্যন্ত সহজ উপহাসেই যেন মিটাইয়া দিলেন। তাহার পরে বিজ্ঞান শাস্ত্রে জীব ও অজীবের মধ্যে যে সকল ভেদ নিরূপক সংজ্ঞা ছিল তাহা তিনি মাকড়সার জালের মতো ঝাড়িয়া ফেলিলেন... ভারতবর্ষ যুগে যুগে যে মহত ঐক্য অকুণ্ঠিত চিত্তে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, আজ যখন সেই ঐক্যসংবাদ আধুনিককালের ভাষায় উচ্চারিত হইল, তখন আমাদের কিরূপ পুলক সঞ্চার হইল তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারিব না। মনে হইল যেন বক্তা নিজের নিজত্ব আবরণ পরিত্যাগ করিলেন, যেন তিনি অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন— কেবল তাঁহার দেশ ও তাঁহার জাতি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ... আমরা অনুভব করিলাম যে এতদিন পরে ভারতবর্ষ শিষ্যভাবে নহে, সমকক্ষভাবেও নহে— গুরুভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সভায় উত্থিত হইয়া আপনার জ্ঞান শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিল, পদার্থ তত্ত্বজ্ঞানী ও ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যে যে প্রভেদ তাহা পরিস্ফুট করিয়া দিল।"

জগদীশচন্দ্রের প্রাপ্তিগুলিকে যুব সমাজের মধ্যে অনুপ্রেরণা জোগাতে, সর্ব প্রযত্নে তুলে ধরতেন নিবেদিতা। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার পর ওদেশে ভালো চাকরির সুযোগ পেয়েও বসু তা নিলেন না। আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষ। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি তাহা হইলে আমার জীবন ধন্য হইবে।" নিবেদিতা এই সিদ্ধান্তে খুব খুশি হয়ে ব্রিটিশ সরকারের কৃপাপ্রার্থী না হয়ে নিজস্ব গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ভাবনায় মগ্ন হলেন। এবং চমৎকৃত হওয়ার কথা, সারা বুল এর যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব নিলেন। বলা বাহুল্য, এই লক্ষ্যেই একদিন নিবেদিতা সারা বুল-জগদীশচন্দ্র সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন হয়তো। ১৯০১ সালে ইংলন্ডে থাকার সময় থেকে নিবেদিতা জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণার কাজে সাহায্য করতে শুরু করেন। ১৯০২ থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যে ড: বসুর তিনটি বই— 'Response in the living and nonliving', 'Plant Response' এবং 'Comparative Electrophysiology' প্রকাশিত হয়। এছাড়া ধারাবাহিক ভাবে বসুর প্রবন্ধগুলি রয়্যাল সোসাইটি পরিচালিত Philosophical Transctions-এ প্রকশিত হয়। এ সবগুলিই নিবেদিতার সম্পাদিত শুধু নয়, নিবেদিতার অসাধারণ ভাষানৈপুণ্য প্রবন্ধগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। ভারতে এসেও এই কাজে দিনরাত এক করে দিয়েছিলেন নিবেদিতা। বসু প্রতিদিন বোসপাড়া লেনে আসতেন এবং বহুক্ষণ ধরে লেখালেখি চলত। বসু নিজে তাঁর প্রেরণা যোগানো নিবেদিতা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'হতাশ ও অবসন্ন বোধ করলে আমি নিবেদিতার নিকট আশ্রয় লইতাম।' নিবেদিতার জীবনীকার লিজেল রেঁম জানিয়েছেন, Plant Response তাঁদের যৌথ উদ্যোগে ছাপা হয়। বসু তাঁর মনের ভাবনাগুলির খসড়া একটা কাগজে লিখে রাখতেন। পরদিন দেখতেন সেগুলি যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, নিবেদিতার দ্বারাই। নিবেদিতার সম্পাদনায় জগদীশচন্দ্রের প্রথম বই Response in the living and nonliving-এর শুরুটা ছিল খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। ১০ মে ১৯০১ সালে ইংলণ্ডে রয়্যাল ইন্সটিটিউশনে বিশ্বের তাবড় বিজ্ঞানীদের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন তাঁর বক্তৃতা Response in the living and nonliving। বিপুল আলোড়ন উঠল বসুর প্রামাণিক প্রদর্শনীতে। তবুও নানা ঈর্ষান্বিত বিজ্ঞানীর বিরোধিতায় রয়্যাল সোসাইটির জার্নালে তা প্রকাশিত হয়নি। অনেক টালবাহানার পর

সোসাইটির পক্ষ থেকে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত জানায়। মানের বিচারে দ্বিতীয় শ্রেণীর জার্নাল লিনিয়ান সোসাইটির জার্নালে (মার্চ ১৯০২) প্রকাশে বাধ্য হন বসু। মধ্যবর্তী সময়ে রয়্যাল সোসাইটি বক্তৃতা থেকে তথ্য নিয়ে ড: ওয়েলার নামে এক বিজ্ঞানী বসুর গবেষণার অগ্রগতিগুলি নিজের নামে অন্য জার্নালে প্রকাশ করে দেন। নীচতার এই উদাহরণে বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় বসু নিবেদিতা ও সারা বুলের সোৎসাহে নিজ উদ্যোগে প্রকাশনার সিদ্ধান্ত নেন। নিবেদিতা তো বসুকে বলেই রেখেছিলেন, আমার কলম অনুগত ভৃত্যের মতাই তোমার কাজ করবে। মানসিক এই অবস্থায় বসু রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন (ভাষান্তরে)

''বন্ধু,

প্রিন্স ক্রোপটকিন সেদিন বিশেষরূপে আমার সমস্ত পরীক্ষা দেখিয়াছেন। তাঁর ন্যায় মনীষী ইউরোপে দুর্লভ। তিনি সমস্ত দেখিয়া বলিলেন, 'আপনার Experiment এবং Argument পরম্পরার মধ্যে সূচাগ্র প্রবেশ করবার ছিদ্র নাই। আপনি অনেক আবরণ ছিন্ন করিয়াছেন, কিন্তু এজন্যই আপনাকে বহু প্রতিবাদ সহ্য করিতে হইবে।''

—তোমার জগদীশ

রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি স্যার উইলিয়ম ক্রুকস প্রমুখ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের নিজস্ব পরীক্ষাগারে এসে পরীক্ষাগুলি দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। পরে ১৯২০ সালে রয়্যাল সোসাইটি তার প্রায়শ্চিত্ত করেছিল জগদীশচন্দ্র বসুকে F.R.S. করে।

ভারতে ফেরার তাগিদ অনুভব করলেও প্রথম গ্রন্থটির কাজ শেষ করার জন্য জগদীশচন্দ্র ও সারা বুল জেদ করতে থাকেন ইংলন্ডে আরও কিছুদিন থাকতে। ওদিকে স্বামীজী স্বয়ং নিবেদিতার ভারতে প্রত্যাবর্তন চাইছিলেন। তখন ইংলন্ডে থাকা রমেশচন্দ্র দত্ত, জগদীশচন্দ্রের বন্ধু এবং স্বামীজীরও আত্মীয়, স্বামীজীকে পত্র দেন, ''ভারতের মঙ্গলের জন্যই নিবেদিতার ভারতে ফিরে যাওয়া আপনার স্থগিত করা উচিত।'' নিবেদিতা দ্রুত গতিতে আরব্ধ কাজ শেষ করলেন এবং সেই সঙ্গে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে লিখে চললেন— ইংলন্ডের বিখ্যাত Reviwe of Reviews তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ১৯০২ সালেই বইটি প্রকাশ সম্ভব হয়। জগদীশচন্দ্রের কাজের প্রচারে সদা তৎপর থাকতেন নিবেদিতা। ভারতে ফেরার পর ১৯০২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজের মহাজন কক্ষে তিনি বলেন, ''আসুন, মাতৃভূমির অপর এক বিশ্বস্ত সন্তানের কথা বলি, যিনি বহু দূরে একাকী কাজ করে যাচ্ছেন, যাঁকে সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে স্মরণ করা প্রয়োজন প্রতিদিনের প্রেমে ও প্রার্থনায়। আমি অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর কথাই বলছি।'' বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পরও তাঁর জীবন ও বাণী প্রচারের জন্য ভারত পরিক্রমাকালেও জগদীশচন্দ্রের কাজ সম্পর্কে অবহিত রাখার প্রয়াসে নিরলস থাকতেন। ২৬ অক্টোবর ১৯০২ সংখ্যা The Indian Social Reformer জানাচ্ছেন, Sister Nivedita gave the students of Bombay the otherday a view of the discoveries of Prof. Bose"। ১৩ অক্টোবর ১৯১১ এই আলোক শিখা নিবেদিতার জীবনাবসান হলো। কোনও দেশের জন্য কোনও ব্যক্তি, মহিলা বা পুরুষ অন্যত্র জন্মেও সেই দেশের জন্য এতটা ভাবতে পারেন, এতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন, এতটা সংগ্রাম করতে পারেন, এতটা দুঃখ দুর্দৈব ঝুঁকি বরণ করে নিতে পারেন, এতটা ভালবাসতে পারেন নিবেদিতার উদাহরণ না থাকলে ভাবাই যেত না। ভারতবাসীর সৌভাগ্য, এমন একজনকে তারা পেয়েছেন। ভাবতবাসীর দুর্ভাগ্য যে এমন মানুষের যথাযথ মূল্যায়ন তারা সর্বাংশে করতে পারেনি, আজকের অতিপ্রয়োজনীয় সময়েও পারছে না। এবারে এই প্রবন্ধের উপসংহারে আসা যেতে পারে। ১৮৯৯ থেকে ১৯১১ — এই বারো বছর মাত্র জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার সংযোগ ও সম্পর্ক। কিন্তু এই বারো বছরেই নিবেদিতা-সৃষ্ট অনুপ্রেরণা জগদীশচন্দ্রের বাকি গবেষণা জীবনে যে প্রভাব বজায় রেখেছিল তা যেমন ব্যাপক যেমন সুগভীর তেমনই সৃজনমুখী। বিজ্ঞান গবেষণার লব্ধ তত্ত্বতথ্য, তার প্রকাশ প্রচার ও সংরক্ষণের যে বাস্তব প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁর মাত্র বারো বছরের কর্মচঞ্চল জীবনে বলে গিয়েছিলেন তা ভারতীয় গবেষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ বলে ভাবা যেতে পারে। তা ঠিকমতো হৃদয়ঙ্গম হয়নি বলে যেমন ভুগেছিলেন, বঞ্চিত হয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র তেমনই হয়েছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা পরবর্তীকালে। ভারতে নিবেদিতার কর্মপ্রয়াস-চরিত্র বিশ্লেষণ যত হবে ততই আমাদের বিজ্ঞানীরা বাস্তব সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করবেন। ৩০ নভেম্বর ১৯১৭ বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জগদীশচন্দ্রের স্বপ্ন ও নিবেদিতার লক্ষ্য পূরণ হলো, হয়তো আশা করি নিবেদিতার আকাঙ্ক্ষাও পূরণ হয়েছিল সেদিন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ''মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন কর মহোৎসব আজ হে, শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে...''

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের দ্বারদেশে দেওয়ালের গায়ে খোদিত দীপহস্তে নারীমূর্তিটি নিবেদিতার পুণ্য স্মৃতি এবং তাঁর প্রতি অসীম শ্রদ্ধার নিদর্শন। অধ্যাপক গেডিস লিখেছেন, ''বিজ্ঞান ও ভারতের বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ বহু কাঙ্ক্ষিত এই গবেষণাগারের বাস্তব রূপ গ্রহণে নিবেদিতার জ্বলন্ত বিশ্বাস কম প্রেরণা ও উৎসাহ দেয় নাই। তাঁহার (বসুর) গবেষণাগারের প্রবেশপথে সম্মুখস্থ মন্দিরাভিমুখে দীপ্তহস্তে নারীমূর্তিটির এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।''

তথ্যসূত্র : (১) উদ্বোধন, কার্তিক, ১৪২৩ (২) দেশভক্তের চিঠি, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২ (৩) বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, শংকরী প্রসাদ বসু (৪) Nivedita of India - RKM Institute of Culture - Gol park, Kolkata.।

আরব সভ্যতায় ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার অবদান

সৌমেন নিয়োগী

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে হজরত মহম্মদের এক বৈপ্লবিক ও বিস্ফোরক একেশ্বরবাদ মন্ত্রশক্তিতে প্রবুদ্ধ হয়ে শুষ্ক মরুভূমির আদিম বর্বর জীবনচারী, ছন্নছাড়া, ক্ষুধার্ত বেদুইন আরবরা মহাপরাক্রমে ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে পৃথিবীর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে। তাদের এই ভূমিকা ঐতিহাসিক দিক থেকে এক চমকপ্রদ ঘটনা। আরবদের এই নতুন একেশ্বরবাদী উন্মত্ত ধর্মান্দোলনের মহাপ্লাবনের ফলে নবির মৃত্যুর মাত্র ১১৮ বছরের মধ্যে ইউরোপের স্পেন, উত্তর আফ্রিকা-সহ এশিয়ার পূর্বদিকে ভারতবর্ষের সিন্ধু প্রদেশ পর্যন্ত প্রাচীন পৃথিবীর এক বিস্তীর্ণ জনপদ ইসলামের বিজয় পতাকার তলে চলে আসে। সুবিশাল এই সাম্রাজ্যের ঐক্যতান নিহিত ছিল তাদের পবিত্র তীর্থস্থান মক্কাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ইসলামিক সৌভ্রাতৃত্ব। সুতরাং ধর্মের নিয়ম ও অনুশাসন অনুসারে সঠিক সময় মতো উপবাস শুরু বা ভাঙতে গেলে প্রয়োজন চন্দ্রের অবস্থান ও গতি সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান। এবিষয়ে বলে রাখা প্রয়োজন, ইসলামের আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণে আরবভূখণ্ডের মানুষদের কাছে 'চন্দ্রের' এক বিশেষ তাৎপর্য ছিল। কাজেই মুসলমানদের প্রার্থনার রীতি অনুযায়ী তাঁদের প্রার্থনার সঠিক স্থান নির্ণয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। যার ফলে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা হেতু সঠিক দিক্ নির্ণয়েরও প্রয়োজন দেখা দিল। সহসা এই প্রয়োজনীয়তার অনুভবের ফলেই ধর্মীয় গোঁড়ামির বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে আরবদের জ্যোতিষচর্চায় মনোনিবেশ ঘটে, মূলত আব্বাসীয় খলিফাদের রাজত্বকালে (৭৪৯-১২৫৮) বাগদাদকে কেন্দ্র করে মুক্তাজ্জীলা প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে। যেখানে বিজিত জাতিদের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের মুক্ত চিন্তার ফল্গুধারার অনুপ্রবেশের ফলেই সমৃদ্ধ হতে থাকে আরব জাতি ও তাদের সভ্যতা। The development of Muslim learning and science reached its culmination during the period of the Abbasid Caliphs (749-1258) on their centre at Baghdad and has been termed by Prof. Bronne as the period of Philosophical and Cosmopolitan Islam. In this period Muslim

Best Compliments from-

Basudeo Lohia
Charity Trust

Kolkata

Best Compliments from-

A
Well
Wisher

civiliation became the inheritor of the ancient wisdom of Assyria, Babylon, Persia, India and Greece.

বাগদাদের খলিফা

''খলিফা আল্ মানসুরের সময় আরবদের সিন্ধু বিজয়ের (৯৫৩-৯৯৮) পর ভারতীয় পণ্ডিতদের সহিত আরব্য পণ্ডিতদের সাক্ষাৎকার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাবের আদান-প্রদানের আর এক সুযোগ উপস্থিত হয়। ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত' বা 'সিন্ধহিন্দ', খণ্ডখাদ্যক বা 'অর্কন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থ এই সময় আরব পণ্ডিত মহলে প্রসার লাভ করে। ইব্রাহিম আল ফাজারি ও ইয়াকুব ইরন্ তারিক নামক দুই আরব্য গণিতজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিতদের সাহায্যে ব্রহ্মগুপ্তের দুই জ্যোতিষীয় গ্রন্থের আরবি তর্জমা প্রণয়ন করেন। এই তর্জমার ফলে ভারতীয় গণিত ও জ্যোতিষ ইসলামিক জগতে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এই দুই শাস্ত্রে আরব্য গবেষণার পথ উন্মুক্ত করে। "It was on this occassion that the Arabs first became acquainted with a scientific system of astromony. They learned from Brahmagupta earlier than from Ptolemy"। (তথ্যসূত্র— বিজ্ঞানের ইতিহাস - সমরেন্দ্রনাথ সেন)। ব্রহ্মগুপ্ত হিন্দু ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র উজ্জয়িনীতে ৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র তিরিশ বছর বয়সে মূলত সূর্যসিদ্ধান্ত ও আর্যভট্টের গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত'। পরে খ্যাতি দেশের সীমানাকে অতিক্রম করে বিদেশেও যথেষ্ট ব্যাপ্ত হয়েছিল। আরবভূমিতে তাঁর এই 'সিন্ধহিন্দ' ও 'অর্কন্দ' নামে প্রচলিত হয়ে আরবদের জ্যোতিষ চর্চায় অগ্রসর হতে সাহায্য করে। তাই George Sarton তাঁর Introduction of the History of Science, Vol.1 গ্রন্থে বলেছেন— "One of the greatest Scientists of His race and the greatest of his time" (তথ্যসূত্র : বিজ্ঞানের ইতিহাস - সমরেন্দ্র সেন)। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় ঋষি পরম্পরায় জাগতিক সমস্ত ক্রিয়াকর্মকে সঠিকভাবে সম্পন্ন বা সামাজিক, ধর্মীয় যে কোনও আচার অনুষ্ঠানকে যথার্থভাবে পালন ও প্রণয়নের জন্য জ্যোতিষের জ্ঞান ও কালনির্ণয় করা অত্যন্ত আবশ্যক হিসেবে মনে করেছিলেন। যার ফলস্বরূপ কাল গণনাসহ বিভিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার উৎসাহের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এইরকম জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার ও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হিন্দু ভারতের উজ্জয়িনী হয়ে উঠেছিল প্রাচীনকালে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। হিন্দু মনীষার সময়ের সেই শেষ পথে যা সময়ের ঊর্ধ্বে তা অনন্ত তাই সেই অনন্তের অন্তরালে সময়কে বৃত্তীয় /বৃত্তাকার পরিমণ্ডল ধার্য করে নিয়ে সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার নিমিত্তে সময়কে বিভিন্ন কল্পে বিভাজনের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করেছে। সেই অতীন্দ্রিয় দার্শনিক চিন্তনের ফলেই উজ্জয়িনীর মহাকালের আবির্ভাব। উজ্জয়িনীতে মহাকালের প্রকৃত স্থান প্রাচীনকালের পৃথিবীর প্রধান মধ্যরেখা (prime meridian) এবং কর্কটক্রান্তি রেখার (Tropic of cancer) ছেদবিন্দু হওয়ার জন্যই সমস্ত রকম কালগণনার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। উজ্জয়িনী হয়ে উঠেছিল সত্যিকারের ভূ-জ্যোতিষ গণনার এক আদর্শ স্থান। কাজেই খুব সঙ্গত কারণেই উজ্জয়িনীতে জ্যোতিষচর্চা অত্যন্ত প্রাচীন এবং যথার্থ বৈজ্ঞানিক। যার প্রশস্তি সুদূর দেশবিদেশে সমাদৃত ছিল। হিন্দুদের এই গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান আরবদের যথেষ্ট প্রভাবিত করে। "Notable Indian influence is evidenced from Al-Fazaris Kitab-ul-Zij (tablets) complied in the second half of the eighth century A.D. The cupola of the earth (Qubbatul Ayin) recorded as Arin which according to Kramers is a corrupt reading of Ujjayini (Ujjain) and points to the direct Indo-Arab contact in the field of astromony".

চন্দ্রের নিয়মিত ব্যবধানে পুনঃ পুনঃ ঘটিত চন্দ্রকলার বৃদ্ধি ও হ্রাসকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চন্দ্রদিন, মাস ও গ্রহণ ইত্যাদিকে সঠিকভাবে গণনা করার পদ্ধতি আরবরা ভারতীয়দের কাছ থেকে আয়ত্ত করেছিল। হিন্দুদের থেকে প্রাপ্ত গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধার থেকেই সম্ভব হয়েছিল। যার ফলে আরবেরা ভূগোল, রসায়ন ও সমুদ্র সম্বন্ধীয় ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি সাধন করে। ভারতীয় জ্যোতিষের প্রভাব আরবদের মধ্যে এতটাই অনুভূত হয়েছিল, যার ফলে— 'ফ্লেরিয়ান ক্যাজরি লিখিয়াছেন, ৭৭২ খ্রিস্টাব্দে এক হিন্দু জ্যোতিষ আল্-মান্ সুরের সভায় আসেন এবং হিন্দুদের সিদ্ধান্ত, জোতিষীয় তালিকা ও গণনার কথা খলিফার নিকট জ্ঞাপন করেন। খলিফা হিন্দুদের এই শাস্ত্রের উৎকর্ষ উপলব্ধি করিয়া আরবি ভাষায় তর্জমা করার আদেশ দেন। আরব্য গণিতের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কারা-দ্যভোও বাগদাদে খলিফার সভায় এক হিন্দু

জ্যোতিষীর উপস্থিতির কথা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি এই জ্যোতিষীর নামোল্লেখ করিয়াছেন মঙ্কা' (তথ্যসূত্র : বিজ্ঞানের ইতিহাস)। পরবর্তীকালে বার্মাক বংশীয়রা যাদের পূর্বপুরুষ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বৌদ্ধ ছিলেন সেই জ্ঞানের ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন খালিফা হারুন-অল্ রসিদের সময় পর্যন্ত। চন্দ্রের সঠিক অবস্থান ও ধর্মীয় প্রার্থনা ইত্যাদির সঠিক দিক নির্ণয়ের জন্য আরব মুসলমানদের মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যা ও জোতিষ সম্বন্ধীয় জ্ঞান আহরণের জন্য প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ার ফলে ৮০৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সহায়তায় বাগদাদ ও দামাস্কাসে মানমন্দিরে (Astronimical observatory) প্রতিস্থাপন করা হয়, যা পঞ্চদশ কি ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোথাও বর্তমান ছিল না, যার ফলে নবম শতাব্দীর শেষভাগে বাগদাদের বাব্-আত্-তাকে মানমন্দিরে মুসা ভ্রাতৃত্রয় তাঁদের গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক অন্বেষণের এক উল্লেখযোগ্য সাফল্যের দৃষ্টান্ত রেখে যেতে সক্ষম হন।

খলিফা আল্-মামুনের সমসাময়িক 'মহম্মদ ইবন মুকা আল্ মোয়ারিজমি' খলিফার ইচ্ছা অনুসারে টলেমির জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণ ও তালিকা পুনঃপরীক্ষা করেন ও ভারতীয় সিদ্ধান্তের আলোচনা ও ব্যাখ্যা রচনায় মনোনিবেশ করেন। কার্যত আব্বাসীয় খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরব সাম্রাজ্যের রাজধানী বাগদাদে যে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা ধারার জন্ম ও সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার ভিত্তিই ছিল ভারতবর্ষ। "The Baghdad school represented the Indian scientific approach and spirit"। খলিফা আল-মামুনের গ্রন্থাগারে নিযুক্ত এই আরব জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ বৈজ্ঞানিক মিশনের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ফলে তিনি সম্ভবত ভারতবর্ষ ও গান্ধার প্রদেশে পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং তার ফলেই ভারতীয় গণিত ও জোতিষের সঙ্গে তার পরিচয় ও সম্পর্ক হয়। আরব দেশে আব্বাসীয় খলিফাদের অনুপ্রেরণায় ও তাদের মুক্তচিন্তনের ফলে জ্যোতিষ, গণিত-সহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উন্নতিসাধন হয়েছিল যার মধ্যে অন্যতম প্রতিথযশা মুসলমান বিজ্ঞানী আবু রৈহান মহম্মদ ইবন অহমদ আল্-বিরুনী (৯৭৩-১০৪৮)। তিনি আর্যভট্ট, বরাহমিহির প্রমুখ ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীর রচনা ও জ্ঞান আহরণ করেন এবং আল্-কানুন আল্-মাসুদি নামক এক জ্যোতিষীয় বিশ্বকোষ রচনা করেন। তাই ভারতীয় কালগণনা ও জ্যোতিষ চর্চার যে জ্ঞান উজ্জয়িনীতে সুদুর অতীতে ঋষি প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হয়, সারা বিশ্বে বিশেষ করে, আরবভূমিতে যেভাবে বিস্তার ও প্রসারিত হয়, তার ফলে পরবর্তী আরব পণ্ডিতরা জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতের জ্ঞানে প্রভূত সাফল্য লাভ করেন ও তার প্রসারণ করেন। কাজেই আরবদের জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষার অবদান অনস্বীকার্য যা ক্রমশই বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত হতে চলেছে।

তথ্যসূত্র : বিজ্ঞানের ইতিহাস — সমরেন্দ্রনাথ সেন।
India's Contribution to world thought & Culture.

মহাকাল মন্দির, উজ্জয়িনী

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ

অধ্যাপক জয় সেন

উত্তরে অনন্তের প্রতীক— প্রশান্ত ধ্যানগম্ভীর শ্বেত ধবল হিমালয়। পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম জুড়ে নীল মহাসাগরের বিস্তৃত প্রসার। মধ্যে নদ ও নদীর প্রবাহ ও পবিত্র অববাহিকা। সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র এই আর্যাবর্তকে পশ্চিম ও পূর্বপ্রান্তে ধারণ করে আছে। মধ্যে ভাগীরথী গঙ্গা অবশেষে সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থরাজ সাগরসঙ্গমে এসে মিশেছে। এই আমাদের সনাতন ভারতবর্ষ। আর্যাবর্ত— চিরন্তন দেবভূমিরূপে খ্যাত। ঋষি-মহর্ষিদের যুগে যুগে কল্পে-কল্পে নিত্য তপস্যার স্থান। মানব-বিকাশের ও বিবর্তনের বিরাট পথ ধরে এই দেশের মানুষ তাই অন্তর্মুখী। যুগ-প্রয়োজন বৈদিক ও উপনিষদিক যুগদ্বয়ের পরে আজ অবধি সেই ধারা অব্যাহত ও প্রবাহিত আছে।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—

''ভূমধ্যসাগরের পূর্বকোণে সুঠাম সুন্দর দ্বীপমালা পরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বিভূষিত একটি ক্ষুদ্র দেশে অল্পসংখ্যক অথচ সর্বাঙ্গসুন্দর, পূর্ণাবয়ব অথচ দৃঢ়স্নায়ুপেশীসমন্বিত, লঘুকায় অথচ অটল-অধ্যবসায়-সহায়, পার্থিব সৌন্দর্যসৃষ্টির একাধিরাজ, অপূর্ব ক্রিয়াশীল, প্রতিভাশালী এক জাতি ছিলেন। অন্যান্য প্রাচীন জাতিরা ইঁহাদিগকে 'যবন' বলিত; ইঁহাদের নিজ নাম— গ্রিক।''

যুগচক্রের সুনির্দিষ্ট কালপর্যায়ের ক্রম ধরে এই দুটি দেশ বা জাতির ভাবনা— (১) অন্তর্মুখী ভারতীয় সনাতনধর্ম ও জীবনদর্শন ও ২) বহির্মুখী গ্রীক মানবজীবনের দুটি বিভিন্ন প্রান্ত। আজ তারা আবার মিলিত হতে চলেছে। কীভাবে? বর্তমান লেখা তারই একটা বিশ্লেষণ করতে চলেছে।

'Problem of modern India and its solution -এই রচনাতে স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন—

''ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান। একের গভীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা। একের মূল মন্ত্র 'ত্যাগ, অপরের 'ভোগ'। একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী। একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত। একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ। একজন ইহলোক কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ। একজন নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে উপেক্ষা করিতেছেন। অপর নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখলাভে সমুদ্যত।''

এই আপাতবিরোধী দুটি জীবন ও সমাজদর্শন কি কখনও মিলিত হতে পারে? তা কি সম্ভব?

প্রখ্যাত জার্মান জড়বিজ্ঞানী Werner Heisenberg একটা আশ্চর্য কথা বলছেন— "It is probably true quite generally that in the history of human thinking the most fruitful developments frequently take place at those points were two different lines of thought meet."

আশ্চর্যভাবে পূর্ব-উল্লেখিত রচনাতে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, এ একই কথা। তিনি বলছেন যে অন্তত তিনবার এই দুই বিপরীত ধরনের জীবনদর্শন একীভূত হয়েছে ও তা থেকে মানবসভ্যতার ধারা আরও আরও অনেক এগিয়ে গেছে। স্বামীজী তাই বলেছেন—

Best Compliments from-

A Well Wisher

''সুদূরস্থিত বিভিন্ন পর্বত-সমুৎপন্ন এই দুই মহানদীর মধ্যে সঙ্গম উপস্থিত হয় এবং যখন ঐ প্রকার ঘটনা ঘটে, তখনই জনসমাজে এক মহা আধ্যাত্মিক তরঙ্গে উত্তোলিত সভ্যতারেখা সুদূর সম্প্রসারিত হয় এবং মানবমধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ়তর হয়।''

অতি প্রাচীনকাল হতে এই কয়েকদিনের আগের ইতিহাস অবধি এই দুটি ধারা পরপর তিনবার সম্মিলিত হয়েছে বা সংঘর্ষিত বা সংমিশ্রিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ এদের মধ্যে প্রথমটি উল্লেখ করতে গিয়ে বলছেন,

''অতি প্রাচীনকালে একবার ভারতীয় দর্শনবিদ্যা গ্রিক উৎসাহের সম্মিলনে রোমক, ইরানী প্রভৃতি মহাজাতিবর্গের অভ্যুদয় সুত্রিত করে।''

এই প্রথমটির কয়েক সহস্র বছর পরে ঘটে দ্বিতীয় সংঘর্ষ। তার সম্পর্কে স্বামীজী বলছেন, ''সিকন্দরসাহেব (Emperor Alexander) দিগ্বিজয়ের পর এই দুই মহাজলপ্রপাতের সংঘর্ষে প্রায় অর্ধ-ভূভাগ ঈশাদি (Christianity) নামাখ্যাত অধ্যাত্মতরঙ্গরাজি উপপ্লাবিত করে।''

আর অবশেষে তারও এক হাজার বছর পরে এই দুই ধারার সংমিশ্রণ আবার ঘটে। এই তৃতীয় মিলন সম্পর্কে স্বামীজী বলছেন— ''আরবদিগের অভ্যুদয়ের সহিত পুনরায় ঐ প্রকার মিশ্রণ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন (European Renaissance) করে এবং বোধ হয়, আধুনিক সময়ে পুনর্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলনকাল উপস্থিত।''

স্বামীজী তার ঋষিনয়নে স্থির দেখতে পারছেন যে, পরপর তিনবারের পরে তার চতুর্থ ও চরম মোলাকাতের সম্মিলনকাল আজ উপস্থিত। লক্ষ্য রাখার বিষয় এই যে—

১) এই প্রথম মিলন ঘটেছিল মধ্য এশিয়ায়, যার প্রভাব পশ্চিম এশিয়া অবধি ছড়িয়ে পড়ে। পারস্যের জরথুস্টের ধর্ম (Zorostrianism) এর দ্বারা পুষ্ট হয়।

২) দ্বিতীয় মিলন ঘটেছিল পশ্চিম এশিয়াতে যা পূর্ব ইউরোপ অবধি ছড়িয়েছিল।

৩) তৃতীয় মিলন ঘটে পশ্চিম ইউরোপে যা অবশেষে আমেরিকান সভ্যতার জন্মের কারণস্বরূপ হয়ে ওঠে। এবং তার প্রভাব আজ আমেরিকাকে অতিক্রম করে, প্রশান্ত মহাসাগরকেও অতিক্রম করে পূর্ব এশিয়ার তটে (Asia Pacific Rim) -এ প্রবিষ্ট হচ্ছে। তার থেকে পরপর জেগে উঠছে জাপান, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, সিঙ্গাপুর ও অবশেষে আরও অভ্যন্তরে পূর্ব-রাশিয়া ও চীন দেশ।

এই মহাশক্তির সম্মিলন আস্তে আস্তে এশিয়ার প্রাণকেন্দ্র ভূমিতে প্রবিষ্ট হচ্ছে! তার থেকেই চতুর্থ মহামিলন নিশ্চিত। তাই স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—

''এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।''

আই আই টি খড়্গপুরের একটি মহাপ্রকল্প 'The Science and Heritage Initiative' বা সন্ধির আদর্শ অনুসারে স্বামী বিবেকানন্দের এই চতুর্থপর্যায়ের মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের কথার ওপর আমরা কাজ করে চলেছি। এই পরপর চারটি পর্যায়ের ওপর সর্বজনগ্রাহ্য ও বিশেষত শিশুমনের জন্য আমরা গল্পাকারে কয়েকটি বই পরিকল্পনা করেছি। তার মধ্যে বলা যেতে পারে পরপর চারটি বইয়ের ক্রম-প্রকাশের মধ্যে প্রথমটি, যার নাম 'সিন্ধু হতে সায়ন' (আনন্দ পাবলিশার্স) তা মুদ্রিত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়েছে। আপনাদের জন্য।

ভারতসভ্যতার সনাতন ধর্মের শাশ্বত মূল ও প্রবাহিত ধারার অব্যাহত ইতিহাস ও তার সঙ্গে সঙ্গে রহস্য-রোমাঞ্চ ভরা একটা অভিযানমূলক গল্পের আকারে এই চরম সত্য আমরা জনপ্রিয়স্তরে তুলে ধরেছি। আমরা আশা করে আছি, এর পরের পরপর তিনটি বই আমরা প্রকাশিত করতে পারব আপনাদের জন্য। আর তুলে ধরতে পারব না-বলা, না-জানা, হারিয়ে যাওয়া আমাদের দেশের সত্যকারের ইতিহাস ও তার ভবিষ্যৎ। 'সিন্ধু হতে সায়ন' বইটিতে তার প্রথম ইঙ্গিত আপনারা পাবেন। আমাদের এই প্রচেষ্টা ও আপনাদের সকলের অনেক আন্তরিক ইচ্ছার মধ্যে দিয়েই আমাদের সনাতন ধর্ম আবার সমগ্র বিশ্বে নিত্য মর্যাদা পাবে। তাই এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।

শুভ দুর্গাপূজার প্রীতি

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

— জনৈক শুভানুধ্যায়ী

উপন্যাস

কুসুম কুমারী

সুমিত্রা ঘোষ

'নমস্তে মাস্টারজী। অব্ কহাঁ চল পড়ে?'

'আরে ফল্গু, ম্যায় ঔর কহাঁ যা সক্তা হুঁ? ও-হি লখনৌ যা রহা হুঁ। সরকারি দপ্তরো মেঁ ধর্না দেনে কে লিয়ে।'

কাঁধে কিট্ ব্যাগ, পরনে ধুতির ওপর ফুলহাতা সাদা শার্ট, সাদা বেশি কালো কম মাথা আর দাড়ির চুল। মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিটি এই গ্রামের মেরুদণ্ড। নাম পরমেশ্বর শর্মা। পেশায় স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের মাস্টার। আঞ্চলিক ভাষা তার পিতৃদত্ত নামটিকে বিকৃত করে পর্মেশ শর্মা করে দিয়েছে। নিজগুণে তিনি শুধুমাত্র নিজের গ্রামে নয়, আশপাশের লোকালয়গুলোতেও শ্রদ্ধা আর সম্ভ্রমের সঙ্গে আদরণীয় মানুষ। ছোটবেলা থেকেই গাঁয়ের সাধারণ বালকদের থেকে পর্মেশের ভাবনাচিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা রকমের ছিল। অগোছালো, নোংরা কোনও কিছু সে পছন্দ করত না। অস্বাস্থ্যকর গোয়াল আর পচা ডোবা দেখলেও নাক কুঁচকে রাখত বালক পর্মেশ। বছরের কয়েকটা বিশেষ ঋতুতে কত লোক মরে যেত বাহ্যে-বমি করে। যে বয়সে এসব ভাবার কথা নয়, সেই বয়সেই ও এসব ভাবনা ভাবত। গ্রামের একমাত্র প্রাইমারি স্কুলে পড়তে যেত। ওর বাবুজী এই স্কুলের শিক্ষক। বাবুজীকে প্রশ্নবাণে নাজেহাল করে দিত ছেলে। বাবুজী রাগ করত না। বলতো, তুই বড় হয়ে এই গ্রামের চেহারা বদলে দিস।

পরমেশ্বর সেই কাজটাই করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। শাহাগঞ্জ আর ডেহরী ঘাটের সংযোগস্থলের অভ্যন্তরে হরিয়াল গ্রাম বর্তমানে একটি আদর্শ গ্রাম বলে মানা হয়। পরমেশ্বর নিজের আত্মার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল, বিদ্যার্জন শেষ হলে নিজের গ্রামের জন্য সে তার শিক্ষাদীক্ষা উৎসর্গ করবে। পাঠশালার পাঠ শেষ হলে বাবুজী ওকে লখনৌতে নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে পড়িয়েছিলেন। হাইস্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পুরো শিক্ষাজীবনটাই ওর লখনৌতে কেটেছে। নগরতান্ত্রিক সুখ-সুবিধার যতটুকু সম্ভব নিজের গ্রাম অবধি পৌঁছে দেবার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে ছাত্রজীবনেই হরিয়াল গ্রামের সমবয়সী ছেলেদের নিয়ে একটা ক্লাব তৈরি করে ফেলেছিল, শুধুই অবসরের আড্ডা আর ফুটবল খেলার জন্য। মনের গোপনে পরিকল্পনা ছিল, এই ক্লাব থেকেই একটি সঙ্ঘ তৈরির যাত্রা শুরু করা। সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ছুটিতে বাড়ি এসেই ক্লাবের ছেলেদের নিয়ে ছোট ছোট সংস্কারের কাজ যেমন— পাতকুয়োতে বস্তায় করে ফিটকারি ফেলা, কোনও পচা পুকুর পানামুক্ত করে পরিষ্কার করা, কোথাও মাটির রাস্তায় পট-হোল বুজিয়ে ভরাট করা— এমনি ছোট ছোট কাজগুলো দিয়ে আরম্ভ করেছিল। অন্য ছেলেরাও বেশ উৎসাহিত হতে লাগল। অবসর বিনোদনের নতুন ফর্মূলা পেয়ে খুশিই হলো তারাও। হরিয়াল মূলত কৃষিপ্রধান গ্রাম। ইন্ডাস্ট্রি-কটেজ কিছুই নেই। যারা শহরে গিয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে পেরেছে তারা চাকরি সূত্রে শহরেই থাকতে বাধ্য হয়েছে। আর যারা প্রাইমারি স্কুলের পর আর এগোবার সুযোগ পায়নি, তারা কৃষিকাজেই থেকে গেছে। এদের সাথে নিয়েই পরমেশ্বরের গ্রামসেবা কাজ শুরু হয়েছিল। আস্তে আস্তে গ্রামের প্রদূষিত পরিবেশ পরিচ্ছন্ন হতে লাগল। মানুষের মধ্যেও একটু একটু করে সচেতনতা জাগতে লাগলো। পরমেশ্বর বুঝতে পারল, গাছে মুকুল এসেছে, তবে ফল হতে এবং পাকতে আরও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে। অনেক ধৈর্য অনেক অসাধ্য সাধন করার পরীক্ষা পাশ করতে হবে ওকে। বহুযুগের অন্ধ কুসংস্কার, অশিক্ষা, জাতপাতের অলঙ্ঘনীয় দেওয়াল ভাঙতে হয়তো ওর সারা জীবনটাই ব্যয় হয়ে যাবে, যাক্ গিয়ে। নিজের প্রতিজ্ঞা থেকে নড়বে না ও কিছুতেই।

ওর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হতে হতে প্রাইমারি স্কুলটা মিডল স্কুল হয়েছে। এম-এ পাশ করে পরমেশ্বর অন্য কোনও দিকে না তাকিয়ে এই মিডল স্কুলে চাকরি নিয়ে ঢুকে পড়ল। কারণ কাজ করতে হলে সেই স্থানে থেকেই করতে হবে। সেই থেকে ওর জীবনের দৌড় শুরু হলো মহকুমা থেকে রাজধানী লখনৌ হয়ে প্রয়োজনে দিল্লি দরবারের দপ্তরগুলির দিকে। সেই দৌড় এখনও থামেনি। আজও মাস্টারজী চলেছেন লখনৌয়ের উদ্দেশে। গ্রাম থেকে তিন কিমি হেঁটে হাইওয়েতে গিয়ে লখনৌগামী বাস ধরবেন বলে হনহনিয়ে চলেছেন তিনি। পথে যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে, সেই তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছে। কারণ তারা জানে, বিনা প্রয়োজনে মাস্টারজী বাইরে যান না। তিনি বাইরে যান গ্রাম উন্নয়নের স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে। আজ এই গ্রামে যা কিছু উন্নতি হয়েছে, সব কিছুই এই নিরলস নিঃস্বার্থ মাস্টারজীর পরিশ্রমের জন্য হয়েছে। ত্রিশ বছর আগের বিবর্ণ চেহারার গ্রামটাকে কসমেটিক সার্জারি করে এই পুরুষসিংহ সুজলাং সুফলাং আধুনিক গ্রামে রূপান্তরিত করেছেন। হরিয়াল এখন ইউপি-র অন্যতম আদর্শ গ্রাম। প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর শৌচালয় প্রকল্পের আগেই হরিয়াল গ্রামে স্যানিটারি ল্যাট্রিন, বাথরুম তৈরি হয়ে গেছে ঘরে ঘরে। জুনিয়র মিডল স্কুল, হাইস্কুলের অ্যাফিলিয়েশন পেয়েছে। মেয়েদের জন্য বাঞ্জার জমিকে কাজে লাগিয়ে ইঁট-সিমেন্টের দেওয়াল, মাথার ওপর টিনের চাল দিয়ে আলাদা স্কুল হয়েছে। সন্ধ্যেবেলা পুরনো ক্লাবঘর সংস্কার করে বয়স্ক শিক্ষার ক্লাশরুম করা হয়েছিল কুড়ি বছর আগে। হরিয়াল গ্রামের চাষিরাও এখন আখ্বার পড়তে পারে। স্বাস্থ্য পরিষেবা বলে কিছুই ছিল না। সামান্য অসুখেই মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যেত। গোরুর গাড়িতে করে সতেরো কিমি দূরে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতে পথেই মরে যেত রোগী। এই পরমেশ্বর ছিনে জোঁকের মতো স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পেছনে পড়ে থেকে

প্রথমে একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র আদায় করেছিল, পরে সেটাকে পাঁচ বেডের একটা ছোট হাসপাতাল করে ছেড়েছে। ওর আরও কতশত কীর্তি! পরমেশ্বর হরিয়ালের অহংকার, ও হরিয়ালের প্রাণ। পলিটিক্যাল পার্টিগুলো বছরের পর বছর ধরে ওকে নিজেদের দলে পাবার জন্য লালায়িত হয়ে আছে, কিন্তু পরমেশ্বর ওই পথে পা মাড়াবে না বলে জেদে অটল। এই ব্যাপারে ওর বক্তব্য স্পষ্ট— 'আমি তো সারা দেশের ঠিকা নিইনি। আমি শুধু আমার গ্রামটার ঠিকা নিয়েছি। রাজনীতির নোংরা জলে নেমে নিজের শরীর-মন নোংরা করব এমন বোকা নই মনে হয়।'

ফল্গু বলে— 'ওহ্ তো মালুম হ্যায় কোই না কোই জরুরত আন্ পড়া হোগা। পরন্তু মাস্টারজী আপনি গ্রামের বেকার ছেলেদের ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে অটো রিক্সা কিনে চালাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, ওরা অটো কিনে এই গ্রাম থেকে পনেরো কুড়ি কিমি অব্দি অটো চালিয়ে রোজগার করছে এখন। ওদের একজনকে ডেকে নিলে তো আপনার কষ্ট হতো না। গরম পড়ে যাচ্ছে, এতটা পথ হেঁটে যাচ্ছেন, তাই বলছি।'

পাশে পাশে হাঁটতে থাকা গ্রামের কিষান ফল্গুর পিঠে হাত রেখে মুচকি হেসে মাস্টারজী বলেন—'যেদিন থেকে অটোতে চেপে যাব, সেদিনই হাইওয়ে তক্ হেঁটে যাবার সারাজীবনের কষ্টটা ভুলে যাবো ফল্গু।... এবার এই কষ্ট দূর করার সংকল্প নিয়ে যাচ্ছি। শাহাগঞ্জ আমাদের হরিয়াল থেকে সতেরো কিলোমিটার দূরে। যদি এখানে একটা লাইন টেনে এক মিনিটের হল্ট স্টেশনও করে দেয় রেলওয়ে, তাহলে আশপাশের কতগুলো গ্রাম উপকৃত হবে ভাবো তো? হাইওয়ে দিয়ে ১৭ কিমি হলে রেলওয়েতেও তাই হবে তা তো নয়। মাঠঘাটের ওপর দিয়ে ৯-১০ কিমি হবে বড়জোর। এইটুকু একটা লাইন বহু মানুষের লাইফ লাইন হতে পারে।'

লেখাপড়া জানা সম্পন্ন কিষান ফল্গুর চোখের পলক পড়ে না। টিপ করে মাস্টারজীর হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম করে বলে— 'জয় হো।' আমি আমাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলোর কিষান ভাইদের জান দিয়ে বোঝাবো আপনার কথা। সবাই সামান্য সামান্য জমি ছাড়লেই এমন মহৎ উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে। ওরাও আমাদের মতোই আপনাকে দারুণ শ্রদ্ধা করে মাস্টারজী। আপনি রেল দপ্তরকে বলবেন জমি আমরা দেব, ওরা শুধু লাইন পেতে দিক।'

মাস্টারজী বললেন —'স্বপ্ন দেখা ভালো, স্বপ্ন দেখ। তবে আমরা চাইলাম বলে সরকার এক কথায় মেনে নেবে এমনটা হবে না। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, হাজারবার গিয়ে ভিক্ষা চাইতে হবে, তবে যদি মন গলে সরকারের। তাতেও না হলে ধর্না আন্দোলনের শেষ পথে যেতে বাধ্য হতে হবে। আন্দোলন-টন আমি পছন্দ করি না। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে একেবারে শেষ চেষ্টা হিসাবে করে ফেলতেও পারি তোমাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে। ... তাছাড়া দেখ, তুমি না হয় এদিকে কিছু জমি দেবে, কিন্তু রেলমন্ত্রক যদি রাজি হয়ও, ওরা কোনদিক দিয়ে লাইন আনবে জানা নেই। আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি যদি কিছু হয়। আপাতত এটুকুই। এই দেখো না, গার্লস স্কুলটার স্থানান্তর হলো, কিন্তু নিজস্ব অ্যাফিলিয়েশন হলো না আজও। বয়েজ স্কুলের সঙ্গে কো-এডুকেশন তক্মা নিয়েই চলছে।

— 'মাস্টারজী, আপনার যাত্রা শুভ হোক। আজ অবধি আপনি যে কাজ হাতে নিয়েছেন, সেটা আদায় করেই ছেড়েছেন। কেউ কি ভেবেছিল, হরিয়ালে একজনও নিরক্ষর মানুষ থাকবে না? আমরা একটা হাসপাতাল পাবো? হোক না ছোট, কিন্তু গ্রামে এখন ডাক্তার তো আছে। কী অসাধ্য সাধনই না করেছেন আপনি। আমরা শুধু কিছু ডোনেশান দিয়েই খালাস। কাজ তো আপনি করেছেন।'

বিফল হয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে পরমেশ্বর শর্মাকে। কিন্তু তিনি হতাশ নন, তিনি বারবার আসার জন্য প্রস্তুত। লখনৌতে এলে ইদানিং তিনি তার প্রিয় ছাত্র হরিয়াল গ্রামের ছেলে ডাক্তার অরবিন্দ কুমারের বাড়িতে ওঠেন। ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ডাক্তার। দুদিন ধরে এখানে ওখানে ঘুরে অবশেষে যখন কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির দেখা পাওয়া গেল, তিনি তখন ভয়ানক ব্যস্ত। ঈষৎ বিরক্ত গলাতে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, একটা বাই পোল নিয়ে বিজি আছেন, আগামী দু'মাসে কোনও সময় দিতে পারবেন না আর্জি শোনার জন্য।

লখনৌ থেকে বাসেই ফিরছেন। পারতপক্ষে ট্রেনে চড়ে কোথাও যান, যেখানে বাসে যাবার সুবিধা নেই। তা না হলে বাসজার্নি তাঁর পছন্দ। কারণ, বাস তাকে হাইওয়েতে নিজের গ্রামের সামনে নামিয়ে দেবে। ভলভো বাসে করে এসে চৌরাহা-চৌক বাস আড্ডার সামনে নেমে পড়লেন। এখান থেকে অন্য বাসে করে গন্তব্যে যেতে হবে। টার্মিনাসের ভেতরে যাবার মুখে দুপাশে দুটো গোল সিমেন্ট বাঁধানো বেদি আছে, দুটো প্রাচীন বটগাছকে ঘিরে। এই বেদি মাস্টারজীর খুব প্রিয় ওয়েটিং প্লেস। ওঁর বাস একঘণ্টা পরে ছাড়বে। টার্মিনাসের ভেতরে গিয়ে টিকিট কেটে উনি হাইওয়ের উপর এই বেদিতে শুয়ে থাকবেন। প্রত্যেকবারই এখানেই বসে শুয়ে সময় কাটান। বাস আড্ডার ভেতরটা এমিশনের কালো ধোঁওয়া, ধুলো আর যাত্রীদের ভিড়ে ঠাসা থাকে। নিঃশ্বাস নিতেও অসুবিধা হয়। আর এই বেদিতে খোলা হাওয়ায় নিরিবিলি থাকা যায়। এখানে অন্ধকার বলে রাত্রে এদিকে বসতে কেউ আসে না লক্ষ্য করেছেন বহুবারের আসা-যাওয়ায়। হাইওয়ের দিকে পিঠ করে

বসে বা শুয়ে থাকলে ছুটে যাওয়া গাড়িগুলোর হেডলাইট চোখে আঘাত করে না। মাস্টারজী টিকিট কেটে নিয়ে প্রিয় বেদিতে এসে ব্যাগের ওপর মাথা রেখে শুয়ে থাকেন চুপচাপ।

একটু পরেই বুঝতে পারেন, এই বেদির সামনের দিকে কারা যেন এসে বসল। তারপরই নারীকণ্ঠে ফুঁপিয়ে কান্নার সঙ্গে কিছু টুকরো টুকরো কথা কানে এলো— 'মেরী কসুর ক্যা হ্যায় পিতাজী... কসুর তো উস্‌কা থা... আপ মুঝে কহাঁ লে আয়ে হো... কিঁউ মুঝে ত্যাগ রহে হো... মুঝে কিঁউ য়্যাসা সাজা দে রহে হো... ম্যায়নে ক্যা কিয়া...'

একটা পুরুষ কণ্ঠ বলল, 'তু সমঝনে কা কোশিস নহী কর রহী হ্যায়। হালাত্ ইত্না গম্ভীর হো গয়া কি উস্ হারামজাদা নে হম সবকো জান্ সে মার ডালনে কা ধমকি দিয়া হ্যায়। তুনে উস্‌কা ডাহিনা আঁখ নিকাল লিয়া। অব্ জিন্দগী ভর কে লিয়ে ওয়হ্ এক আঁখ খো দিয়া। ওয়হ্ তুঝে জিন্দা জ্বালাকে মারনে কা কসম লে লিয়া হ্যায়। থানেদার বলরাজকা চামচা হ্যায়, মেরা রিপোর্ট দর্জ করনে সে ইন্‌কার কর দিয়া, ঔর মুঝে হি পিটাই কর ভগা দিয়া। .. তু জানিত হ্যায় বিটিয়া, বলরাজকে সাথ মুকাব্‌লা করনে কা হিম্মত গাঁও মে কিসিকা নহী হ্যায়? তেরে সাথ জো হুয়া ইয়ে পহলে সে হোতা আরহা হ্যায়। কোই কুছ কর নহী পায়া, বলরাজ কা কুছভী নহী বিগড়া। গাঁও কা বহু-বেটিয়া খুদখুশি কর মরতি রহী, লেকিন ইস্ বার তুনে পলটবার কিয়া, নরহুন ঘুসা কর উস্‌কা আঁখ পুরা নিকাল লিয়া।... শুনা হ্যায়, উস্‌কা আঁখ কভী ওয়াপস্ নহী আয়েগা। হাসপাতাল সে হী উস্‌নে অপ্‌নে চেলে সে ধম্‌কি ভেজা হামারা ঘর জ্বালায়েগা ঔর তুঝে সারে-আম জিন্দা জ্বালাকে মারেগা। অব্ তু হী বতা, তুঝে বঁচানে কে লিয়ে মেরে পাস ঔর কোই রাস্তা খুলা হুয়া থা ক্যা?... এক মুসিবত্ কে উপর দুসরা মুসিবত্ আন্ পড়া... তেরি মা-নে বোলা তেরি মাহিনা তারিখ ভী দশদিন পার হো গয়া, মহিনা নহী হুয়া। ইস্‌কা মতলব তু পেট মে ভী হো গয়ী হ্যায়। অব্ গাঁওবালে ভী তুঝে জিনে নহী দেঙ্গে।'

মেয়েটি কঁকিয়ে কেঁদে বলতে লাগল—'লেকিন ম্যায় কহাঁ যাঁউ পিতাজী? ম্যায় গাঁও কে বাহর কভী নহী নিকলী। ইস আনজান দুনিয়া মে পিতা হোতে হুয়ে আপ মুঝে হাজারো বার বালাৎকার হোনে কে ওয়াস্তে ক্যাসে ছোড় কর চলে যায়েঙ্গে? আপ নে মুঝে রক্ষা তো কর নহী সকেঁ অব মরনে কে লিয়ে ছোড় রহে হো? ক্যাসা বাপ হ্যায় আপ? ম্যায় মরনা নহী চাহতী হুঁ পিতাজী... মুঝে বঁচা লো... ছোড়কে মত্ যাও...'

— 'তু পড়িলিখি লড়কি হ্যায়, সমঝদার, হোশিয়ার ভী হ্যায়। খুদ কো বঁচানে কা কোই তরিকা খুদ হী ঢুন্ড লেনা। জিন্দা জ্বল কর মরনে সে জিনে কে লিয়ে কুছ ভী করনা মুমকিন হ্যায়। ... তেরি ব্যাগ মে তিন হাজার রুপাইয়া ঔর তেরী কিতাবেঁ, সার্টিফিকেট— সব কুছ ম্যায়নে ডাল দিয়া। অব্ তু জানে ঔর তেরী নসীব জানে...'

পরমেশ্বর আর থাকতে পারলেন না। যা শোনার যা বোঝার তিনি বুঝে নিয়েছেন। ওরা গাছের পেছনে তার উপস্থিতি টের পায়নি। উনি উঠে ওদের সামনে এসে পুরুষটির উদ্দেশে বললেন, 'নমস্তে ভাইসাব। আমি পরমেশ্বর শর্মা। পেশায় শিক্ষক। পেছনে শুয়েছিলাম আমার বাসের অপেক্ষায়। আপনাদের সব কথাই শুনে ফেলেছি। বুঝতে পারছি, আপনি মহাসংকটে পড়েছেন, কিন্তু তাই বলে নিজের কন্যাকে এইরকম একটা বাস আড্ডায় ছেড়ে চলে যাবেন? অন্য কোথাও কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে তো রাখতে পারতেন। ওর তো সত্যিই কোনও দোষ নেই। বিনা দোষে মেয়েকে মহা সর্বনাশের দিকে বাপ হয়ে ফেলে রেখে যাচ্ছেন আপনি? ধর্ম, বিবেক সব বিসর্জন দিয়ে ফেলেছেন একটা গুন্ডার ভয়ে?'

লোকটি এবার কেঁদে ফেলল— 'জানি, অধর্ম করছি, কিন্তু লাচার বলে করতে বাধ্য হচ্ছি। ও খুব ভালো মেয়ে, এগারো ক্লাশে পড়ে, ক্লাশে ফার্স্ট হয়। আমাদের বাহুবলী এম এল এ-র পেয়ারের ভাতিজা ওকে বলাৎকার করেছে। সম্ভবত ওর পেটে বাচ্চাও এসেছে। বলাৎকারের কথা যদি গোপনও করি, অন্য বিপদটা তো গোপন করতে পারব না ভাইসাব। কুমারী মেয়ে মা হতে চলেছে জানার সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দেবে। নিজের গ্রামে তো ও থাকতেই পারবে না। ওকে তো বলরাজ মেরে ফেলবে, সঙ্গে পুরো পরিবারকে মেরে ফেলবে। আমি সামান্য এক কিষান। ওদের সঙ্গে লড়বার ক্ষমতা নেই। আমি দুর্বল বলেই মেয়ের নজরে, ভগবানের নজরে একজন না-মর্দ বাপ হয়ে অপরাধী হয়ে থাকব। ভাইসাব, আপনি শিক্ষক, আপনাকে দেখে সজ্জন বলে মনে হয়। আমি তো এক মামুলি চাষা। দুনিয়ার কিছুই জানি না। ওকে বলি দিয়ে অন্যদের বাঁচানোর চেষ্টা করাটাই মাথায় এসেছে। আপনি শিক্ষিত মানুষ, দেখুন না ওকে কোনও আশ্রমে যদি রাখে। তাহলে ও বেঁচে যাবে।'

পরমেশ্বরের মুখে কথা ফোটে না। জীবনে এরকম একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, কল্পনাও করতে পারেননি। একটা বাস এসে টার্মিনাসের গেটের সামনে দাঁড়ালো। যাত্রী নামল দু-তিনজন। বাসের হেডলাইটের আলোয় এতক্ষণে মেয়ের মুখ দেখে চমকে উঠলেন তিনি। অপূর্ব সুন্দর একটি ১৭-১৮ বছরের নিষ্পাপ মুখ। কেঁদে কেঁদে দুটো দীঘল চোখ ফুলে গেছে। বিকৃত পুরুষের লালসার শিকার হয়ে গেছে এক নিরপরাধ কিশোরী। ওর সামনে এখন শুধু ব্ল্যাকহোল, যার আদি-অন্ত কিছুই ও জানে না। বেদনায় বুকটা চিনচিন করে ওঠে মাস্টারজীর। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে

পড়েছিলেন। হঠাৎ দেখেন বাসটা ছেড়ে দিয়েছে আর এক লাফ মেরে মেয়ের বাবা বাসের হাতল ধরে ফুটবোর্ডে উঠে পড়েছে। তিনি কালবিলম্ব না করে — 'রুক যাইয়ে রুক যাইয়ে ভাইসাব' বলে বাসের পেছনে দৌড় লাগালেন, কিন্তু বাসও দাঁড়ালো না, ভাইসাবও নামবার চেষ্টা করলেন না। ফিরে আসার জন্য পেছন ফিরেই দেখেন মেয়েটা রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে আর ওর দিকে তীব্র বেগে ধেয়ে আসছে বড় যান— ট্রাকও হতে পারে, বাসও হতে পারে। ছুটে এসে এক ঝটকায় মেয়েটাকে নিজের বুকের ওপর ফেলার সঙ্গে সঙ্গে পাগল গতিতে ছুটে চলে গেল একটা মালবাহী ট্রাক। মেয়েটাকে বুকে চেপে ধরে রেখে তিনি নিজেই তখন কাঁপছেন।

মেয়েটার হাত মুঠোয় ধরে টার্মিনাসের ভেতর টিকিট কাউন্টারে গিয়ে নতুন করে টিকিট কাটলেন দুটো। লখনৌ ফিরে যেতে হবে, অরবিন্দের বৌ গৌরীকে দেখাতে হবে মেয়েটাকে। ওর নামটাও জানা হয়নি এখনও। যা নাটক ঘটে চলেছে তাতে পরিচয় করার সুযোগই ঘটেনি। বাসে বসে কিছু জলপান করে কথা বলা যাবে। একবার আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছেন বটে, তবে ও আবার চেষ্টা করতে পারে। তাই সারাক্ষণ নজরবন্দি করে রাখতে হবে এখন। টিকিট, জল, ফ্রুটজুস, পাউরুটি, মাখন, কলা কিনে আবার ভলভো বাসে চড়ে বসলেন মেয়েটাকে পাশে নিয়ে। খাওয়া দেখে বুঝতে অসুবিধা হলো না যে মেয়েটা উপবাসী ছিল, ভয়ানক ক্ষুধার্ত ছিল। ট্রাকের তলায় পিষ্ট হয়ে মরার চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর এখনও একটাও কথা বলেনি মেয়েটা, বরং পরমেশ্বর যা বলেছেন নীরবে আজ্ঞা পালন করে চলেছে। হয়তো তাঁর উপর আস্থা এসেছে। এটা ভালো লক্ষণ। বাস ছাড়ার আগেই অরবিন্দকে ফোন করে জানালেন যে তিনি চৌরাহা-চৌক থেকে ফিরে আসছেন লখনৌ। সঙ্গে ১৭-১৮ বছরের একটি মেয়ে আছে। বাকি কথা সাক্ষাতে বলবেন। নিজের বাড়িতে স্ত্রী চামেলীদেবীকেও জানালেন আজ রাত্রে ফিরতে পারবেন না। কবে ফিরবেন পরে জানিয়ে দেবেন।

— 'আপ নে কুছ খায়া নহী। ব্রেড মে বাটার লগাকে দেতী হুঁ, কুছ তো খা লিজিয়ে বাবুজী।'— ভারী নরম আর মিষ্টি গলায় বলে ওই মেয়ে।

— 'ব্রেড-বাটার নহী, মুঝে এক কেলে ঔর জুস্ দে দো বেটিয়া।'

—'জী।'

— 'তুমহারা নাম বাতাও।'

— 'আপ নে মুঝে নয়া জিন্দেগী দিয়ে হ্যায়, নয়া নাম ভী আপ দে দিজীয়ে বাবুজী। ম্যায় পুরানা সব কুছ ভুল যানা চাহতী হুঁ।'

— 'অপনা বচ্পন জিন্দেগী কা পহেলা হিস্যা হোতা হ্যায় বেটা, ইসকো ভুল যানা আসান নহী হ্যায়। পুরি জিন্দেগী বচ্পন কা ইয়াদেঁ সাথ সাথ চলতা রহতা হ্যায়।... অব্ তুমকো পড়না হোগা, স্কুল মে দাখিল হোনা পড়েগা তো পুরানা নাম সে হী অ্যাডমিশন মিলেগা। তুম বচ্চী হো, ইস সময় দুখী ভী হো, ইস লিয়ে পুরানা বিতে হুয়ে সময় কো ভুলনে কা ইরাদা মন মে জাগ রহা হ্যায়। ... অব্ নাম বাতাও।'

— 'কুসুম কুমারী সিং।'

এরপর অনেকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ বসে থাকেন। পরমেশ্বর কুসুমকে নিয়ে কী করবেন, কীভাবে মেয়েটাকে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেবেন, সেই ভাবনায় মগ্ন হয়ে পড়েন আর কুসুম ভাবতে থাকে যদি সত্যিই ওর পেটে বলরাজের বাচ্চা এসে থাকে, তাহলে ও কী করবে? ওর নিজের বাবা ওকে হয় মরবার জন্য, নয়তো রেন্ডিখানায় গিয়ে ঘৃণ্যভাবে বেঁচে থাকার জন্য বাজারে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। ও এখন এতবড় পৃথিবীতে একেবারে একা। এই মানুষটি ওকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন, এখন সঙ্গে করে লখনৌ সিটিতে নিয়ে যাচ্ছেন। হয়তো ইনি ওখানেই থাকেন। কিন্তু ওনার তো নিশ্চয়ই পরিবার আছে, ওদেরও সমাজেই বাস করতে হয়, ওরা কি এই মানুষটির মতো ভালো? ওরা ধর্ষিতা, পেটে বাচ্চা আসা অচেনা একটা মেয়েকে আশ্রয় দিতে রাজি হবে? মরা ছাড়া আর কি কোনও পথ খোলা থাকবে ওর জন্য? এত টেনশনের মধ্যেও ওর একটুকরো আনন্দ পড়ে আছে মনের গোপন কুঠুরিতে। ওর নিজের শরীরে কম শক্তি নেই। কর্মঠ এই হাত দুটো দিয়ে বলরাজকে ও প্রচুর আঘাত করেছিল সেদিন, ওর ধারালো দাঁত নখ আর নরুনটা কুকুরটাকে ক্ষতবিক্ষত করে রক্তাক্ত করেছিল। রেপ করে চিৎ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল নিশ্চিন্তে। সেই ফাঁকে ব্যাগে রাখা সর্বক্ষণের সঙ্গী নরুনটা বের করে ডান চোখের ভেতর পুরো ঢুকিয়ে ঘুরিয়ে দিয়ে চোখটাকে উপড়ে নিয়ে সবলে টেনে শিরা উপশিরা ছিঁড়ে বের করে ফেলে মুঠোয় ধরে চটকে দিয়েছে। বাধা দেবার আগেই ও আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়েছিল। বেহোঁশ হয়ে। তখনও নরুন চালিয়েছে গাল, বুক, হাত ফালা ফালা করে। জন্মের মতো কানা করে দিতে পেরেছে— এটাই এত দুঃখের মধ্যে ওর গোপন আনন্দ।

রাত পৌনে এগারোটায় লখনৌ পৌঁছালেন পরমেশ্বররা। অটো নিয়ে চলে যাবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু আরবিন্দ গাড়ি নিয়ে এসে অপেক্ষা করছিল। মাস্টারজীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল অরবিন্দ। কুসুমকে দেখিয়ে পরমেশ্বর বললেন, 'এ কুসুম। বাকিটা বাড়ি গিয়ে বলব। আজ একটা ঘটনাবহুল দিন গেল। ভাবতেও পারিনি যে সকাল বেলা তোমার এখান থেকে বেরিয়ে আবার ফিরে আসতে হবে।'

গ্রামের মানুষের কাছে তিনি মাস্টারজী আর নিজের ছাত্র-ছাত্রীর কাছে তিনি গুরুজী। বাড়ি এসে অরবিন্দ ওর বৌ গৌরীকে বলল, 'আগে ওরা স্নান করে নিলে ভালো হয়। যা গরম পড়েছে!... আর মেয়েটির থাকার ব্যবস্থাও কর। খাওয়া-দাওয়া বোধহয় হয়নি সারাদিন।'

গৌরী বলল— 'ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি শুধু ভাবছি কী এমন হলো যে গুরুজী একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে ফিরে এলেন?'

— 'উতলা হয়ো না। গুরুজী সব বলবেন যথাসময়ে। মেয়েটা কেমন যেন ভয়ে ভয়ে আছে মনে হচ্ছে আমার। বাবলিকে ডেকে বলো, মেয়েটাকে একটু সঙ্গ দিতে। খালি টিভি দেখলেই চলবে? বাড়িতে মেহমান এসেছে, তাদের সঙ্গ দিতে হবে না? এই মেয়েটা তো বাবলিরই বয়সী হবে, এসে একটু কথা-টথা বলুক ওর সঙ্গে।'

— 'যা বলেছ! ওর টিভি-র নেশা এবার ছাড়াতে হবে। আমরা দুজনেই হসপিটাল আর পেশেন্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকি বলে বড় বাড় বেড়েছে ওর। আরে যাহ্! মেয়েটার সঙ্গে স্নান করে পরবার মতো জামাকাপড় আছে কিনা জিজ্ঞেসই করিনি।... দাঁড়াও দেখে আসি।'

কুসুমের ব্যাগে জামাকাপড় ছিল। ওদের স্নান হয়ে যেতে গৌরী খাবার দিয়ে দিল সবাইকে একসঙ্গে। বাবলি আর ছেলে গলু নবাগতার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু নবাগতা নিজের আড়ষ্টতা কাটিয়ে ওদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারছে না, এটা গুরুজী, অরবিন্দ এবং গৌরীর নজর এড়ালো না। যাই হোক, খাওয়ার পালা মিটতে গৌরী মেয়েকে বলল, 'বাবলি কুসুমকে তোর রুমে নিয়ে যা। ও ওই ঘরে শোবে, অন্য খাটটাতে। যাও কুসুম, এবার গিয়ে শুয়ে পড়।'

— 'জী আন্টি'।— বলেই কুসুম প্রথমে মাস্টারজীকে তারপর অরবিন্দকে, শেষে গৌরীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বাবলির সঙ্গে শুতে চলে গেল। ক্লাশ সেভেনে পড়া গলুর এই প্রণাম পর্বটা বড় আশ্চর্য লেগেছে, তাই সে জিজ্ঞেস করল— 'ওহ কুসুম দিদি নে আপলোগোঁ কো অব্ প্রণাম কিস্ লিয়ে কিয়া?'

অরবিন্দ বলল, 'বয়স্কদের প্রণাম করার কোনও সময় অসময় নেই গলু। এটা আমাদের দেশের রেওয়াজ। ইংরেজরা ঘুম থেকে উঠে গুডমর্নিং বলে, রাত্রে শুতে যাবার আগে গুডনাইট বলে। আমরা সকালে উঠে ভগবানকে প্রণাম করি, তারপর বাবা-মাকে করে দিন শুরু করি তাদের আশীর্বাদ নিয়ে। রাতে আবার একইভাবে প্রণাম করে শুতে যাই। ... আমাদেরই ভুল আমরা তোমাদের এই শিক্ষাটা দিতে ভুলে গেছি, তাই তোমরা কর না। তবে আমরা নিজেরা কিন্তু করি। কখনও ভুলি না। আজ কুসুম দিদিকে দেখে শিখলে তো?'

— 'হ্যাঁ, পাপা। বাবলি দিদিকো ভী বতা দুঙ্গা।'— বলে গলু সবাইকে প্রণাম করে বলল, 'গুড নাইট।' — ওরা তিনজনই হেসে ফেললেন। বাচ্চারা চলে যাবার পর মাস্টারজী বললেন, 'বহু, রাত অনেক হয়েছে, সকাল থেকে উঠে তোমাদের ব্যস্ত জীবন। আমি সব জানি, তবুও আর একটু সময় যে আমাকে দিতে হবে, মা। অরবিন্দের থেকেও তোমাকে আমার বেশি দরকার। আজকে আমাকে যে পরিস্থিতিতে পড়ে ফিরে আসতে হলো সেই ঘটনা এখন বলব।'

গৌরী একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, 'কাল আমার অফ ডিউটি গুরুজী। আর ডিউটি যদি থাকতো তাহলেও আমি সারা রাত জেগে থাকতে পারি আপনার কথা শোনার জন্য। বুঝতে তো পারছি, এমন কিছু ঘটেছে, যাতে আপনি বিচলিত হয়েছেন। বলুন গুরুজী। ডাক্তারের রাত জাগার অভ্যাস থাকে, চিন্তা করবেন না।'

এরপর আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা ওদের দুজনকে খুলে বললেন মাস্টারজী।

সব শুনে দুজনেই বলল— 'মেয়েটার কপাল ভালো যে সেখানে আপনি ছিলেন, তা না হলে ও যে কোথায় গিয়ে ঠেকতো, কী ভয়ংকর অবস্থা হতো ভাবতেও ভয় হয়। গুরুজী আপনি অজনা অচেনা একটা মেয়েকে সুস্থ জীবন দানের জন্য এতবড় রিস্ক নিয়েছেন, আর আমরা আপনার পাশে থাকব না, এটা কি হয়?'

গৌরী বলল, 'কাল বাবলি-গলু স্কুলে চলে যাবার পর আমি ওর সঙ্গে কথা বলে জেনে নেব। যদি সত্যিই প্রেগন্যান্সি হয়ে থাকে তাহলে টার্মিনেট করে ফেলা দরকার। কারণ ও এখন আপনার কাছে থাকবে। আপনিও ওকে পড়াশুনা করিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে ইচ্ছুক। আমাদের গ্রামে যতই শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ুক, এখনও এতোটা মুক্তমনের সবাই হয়ে যায়নি যে কুমারী মেয়ে রেপড্ হয়ে প্রেগন্যান্ট হয়ে স্কুলে পড়তে যাচ্ছে— না গুরুজী, এটা মেনে নেবে না বেশিরভাগ মানুষ। ওর লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না।'

অরবিন্দও গৌরীর সঙ্গে একমত। বলল, 'এতদিন হয়ে গেছে, ৪৫ দিন পরে টেস্ট করলেই বোঝা যাবে। তবে ওর বয়স সঠিক কত সেটাও জিজ্ঞেস করে নিও। ওর বাবা তো বলেছে ব্যাগে ওর সব সার্টিফিকেট ভরে দিয়েছে, ক্লাশ টেন বোর্ডের হল কার্ড, পাস সার্টিফিকেট দুটোই চেক করে নিও। ১৮ বছর হয়ে গিয়ে থাকলে টার্মিনেশনে ওর মত আছে কিনা এটাও জানা জরুরি। গুরুজী ওকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজে যেন কোনও বিপদে না পড়েন। কারণ, আমরা কেউই এই মেয়ের সম্বন্ধে কিছুই জানি না। গুরুজী বলেই এই কেস কাঁধে করে

নিয়ে এসেছেন। অন্য কেউ আনতো না। পথে অ্যাকসিডেন্ট কেসগুলো দেখ না? দাঁড়িয়ে মোবাইলে ফটো তুলবে, কিন্তু পুলিশে, অ্যাম্বুলেন্সে একটা ফোন করার চেষ্টা করবে না। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। সময়মতো একটু সাহায্য পেলে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যুর হার ৭৫ শতাংশ কমে যাবে।... আমরাও গুরুজীর সঙ্গে সঙ্গে কুসুমের জন্য কিছু করতে পারলে ধন্য হব এটাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কুসুম পরে গুরুজীর প্রতি কতটুকু কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে কী থাকবে না সেটা বলতে পারব না। জানি, উনি কারও কৃতজ্ঞতার পরোয়া করেন না, বিবেকের আজ্ঞা পালন করে চলেন, কিন্তু কুসুম কখনও গুরুজীকে বিট্রে করলে আমি ছাড়ব না।'

মাস্টারজী বললেন, 'দাঁড়া। বড় ইমোশন্যাল হয়ে পড়িস সামান্য বিষয়ে। কুসুম খারাপ মেয়ে হবে না রে! জীবনের শুরুতেই যে চোট পেল ও সেই চোটই ওকে নীচ হতে দেবে না, দেখে নিস। দেখলি তো ভয়ানক মানসিক যন্ত্রণায় যে মেয়ে কিছুক্ষণ আগে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল, সে কিন্তু শুতে যাবার আগে বড়দের প্রণাম করার শিষ্টাচার ভোলেনি। ও কিচ্ছু ভুলবে না। একটু সুযোগ, সামান্য সহায়তা পেলে ও একদিন মাতা চণ্ডী হয়ে আবির্ভূত হবে বলরাজের মতো সমাজের শত্রুদের জন্য। ... দ্যাখ, তোরা এবরশনের পক্ষে যে যুক্তি দিয়েছিস সেটা অস্বীকার করি অমন সাধ্য আমার নেই। ভালো যুক্তি। একেবারে ওয়েদার ফোরকাস্টের মতো। হরিয়াল গ্রাম সত্যিই এত উদার হয়ে যাবে, এটা আমারও বিশ্বাস হয় না। আমি নিজে অকারণ ভ্রূণ হত্যার বিরোধী। কন্যা সন্তান আছে গর্ভে তাহলে তো সর্বনাশ। এবর্ট করে ফেলো! এইরকম ব্যাপারগুলোকে আমি অপরাধ, হত্যা বলে মনে করি। যে প্রাণ গর্ভে এসেছে সে তো জানে না সে পুং লিঙ্গ না স্ত্রীলিঙ্গ, জানে না তার গর্ভে আসাটা পবিত্রতার সূত্র ধরে, না অপবিত্রতার সূত্র ধরে। হ্যাঁ, বিশেষ ক্ষেত্রে তবুও মানা যায় যদি এই ভ্রূণের জন্য মা-র জীবন সংশয় দেখা দেয় তাহলে টার্মিনেট করা ছাড়া উপায় থাকে না।... কুসুমের যদি গর্ভাবস্থা ধরা পড়ে তাহলে ও যা চাইবে তাই হবে। আমি মতামত দেব না।'

গৌরী সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে— 'আপনি বললেন না যদি মা-র জীবন সংশয় দেখা দেয়, তাহলে মেনে নেওয়া চলে? কুসুমের জন্য তো এটা জীবন সংশয়ই গুরুজী! ওর আত্মহত্যার চেষ্টাই তো প্রমাণ। জীবন সংশয় শুধু শারীরিক কারণে হয় তা কিন্তু নয়, সামাজিক অবক্ষয়ও কারণ হতে পারে। এখন রেপ একটা ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন খবরের শিরোনাম হচ্ছে।

আমরা কতজনের কথাই বা জানতে পারি, বেশিরভাগই তো কুসুমের মতো গোপন থাকে। বাচ্চা মেয়েরা ১৩-১৪ বছর বয়সে জীবন সংশয়ে ভুগে সুইসাইড করে।'

মাস্টারজী হাসিমুখে বললেন, 'আমার চালেই আমার কিস্তিমাত করে দিলে বহু। জয় হো। মেনে নিলাম তোমার যুক্তি।'

অরবিন্দ বলল, 'আমার একটা কথা ছিল। বলছিলাম যে কুসুম তো এখানে আমাদের কাছেও থাকতে পারে। আপনি সারা জীবন ধরে আমাদের গ্রামের মানুষের বোঝা বয়ে চলেছেন, এখন তো দেখছি পথঘাটেও বোঝারা আপনার জন্যই যেন অপেক্ষা করে থাকছে। গুরুজী, কিছু বোঝা আমাদেরও বইতে দিন। কুসুম এখানে থেকেই পড়াশোনা করুক না। বাবলি-গলুর সঙ্গে ভালোই থাকবে ও।'

— 'একেবারে ঠিক কথা বলেছ তুমি। এখানেই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেব। ও এবর্ট করতে চাইবেই যদি প্রেগন্যান্ট হয়ে গিয়ে থাকে তো। এখন গ্রামের মেয়েরা আর বোকা নেই, শহরের মেয়েদের মতোই কেরিয়ার সচেতন হয়ে গেছে। অনেক বুদ্ধি রাখে তারা। ... এই ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও, এটা আমি সামলে নিতে পারব। কয়েক ঘণ্টা আগে ওর মাথার উপর আকাশ ছাড়া আর ছাদ ছিল না। এখন দুর্ভাগ্য ওকে ছেড়ে চলে গেছে। ও একটা পরিবারের ছত্রছায়ায় আশ্রয় পেয়েছে, এটা বোঝার বুদ্ধি কি ওর নেই? হ্যাঁ, এখন থেকে গুরুজীকে দায়-দায়িত্ব নিজের ছেলেদের সঙ্গে, প্রতিষ্ঠিত প্রিয় ছাত্রদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে। উনি একা কেন করবেন আমরা থাকতে?'

— 'আমি জানি তো তোমরা আমার পাশে আছো, তাই তো দায়ে পড়লে ছাত্রদের কাছেই যাই। হংসরাজ, অজয়, বিমান, রামপ্রসাদ, অরবিন্দ— তোমরা যে আমার কলিজার এক একটা টুকরো। তোমাদের সহায়তা না পেলে আমি কি হরিয়াল গ্রামে এত কাজ করতে পারতাম কখনও? এখন কথা হলো, কুসুমের থাকা নিয়ে। তোমাদের কাছে ও হরিয়াল গ্রামের চেয়ে অনেক বেশি ভালো থাকবে, কিন্তু এগারো ক্লাশে মিডিল অফ দ্য সেশন স্কুলে ভর্তি করাবে কী করে? ওর বাপ সব সার্টিফিকেট দিয়েছে, কিন্তু টি.সি. দিয়েছে কি? আমার মনে হয় না, লোকটা টি.সি. দিয়েছে। সে অতো চিন্তাশীল ব্যক্তি নয়, নিজের জান বাঁচানোর চিন্তাটাই ওর বেশি ছিল। নেহাতই বার্থ আর স্কুলের সার্টিফিকেটগুলো সঙ্গে দিয়ে বলেছে ছোটখাটো কাজকর্ম পেলে করিস। যদি পড়ার সুযোগ পাস সে কথা ভেবে বইগুলোও দিয়েছে আর তিন হাজার টাকাও দিয়েছে। টি.সি. ছাড়া কোনও স্কুলে অ্যাডমিশন করাতে পারবে না তোমরা। হরিয়াল স্কুলেই সম্ভব হবে, ব্যাপারটা আমার নিজের হাতে আছে বলে।'

অরবিন্দ হতাশ হয়ে বলে, 'যাহ্! তাহলে তো হবে না।'

— 'আমারও আর একটা কথা ছিল। বলছিলাম, গ্রামের মানুষকে কী বলবেন, কুসুমের কী পরিচয় দেবেন, এটাও ভাবতে হবে। আত্মীয় তো বলতে পারবেন না, কারণ আপনি ব্রাহ্মণ আর ও সিং। হরিয়াল যতই উন্নতি করুক গ্রাম্য কৌতূহল এখনও তীব্রভাবে আছে।'

মাস্টারজী মুগ্ধ গলায় বলেন, 'এই জন্যই আমি মেয়েদের রেসপেক্ট করি। আমাদের মাথায় যা ঠিক সময়ে আসে না মেয়েদের বেলা সেগুলো ঠিক সময়ে মাথায় হাজির হয়ে যায়। বহু, একটা নতুন সমস্যার ইঙ্গিত দিলেন। এখন বহু তুমিই পথ বাত্‌লে দাও তাহলে।'

গৌরী মুচকি হেসে বলল, 'আমাকে পথ বাত্‌লাতে হবে না গুরুজী। আপনাকে মার্গদর্শন করাবার জন্য বাড়ির অন্দরমহলের কর্ত্রীই যথেষ্ট। তিনিই কোনও কাহিনি বানিয়ে আপনাকে শিখিয়ে দেবেন। আপনি শুধু ওনার বলা কথাটুকু শুনে চলবেন, তাহলে সব দিক রক্ষা হবে।'

— 'বেশ! তিনিও চাণক্যর থেকে কিছু কম নন। তুখোড় বুদ্ধি যেমন রাখেন, তেমনি এমন গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারেন যে লোকে দিনকেও রাত বলে বিশ্বাস করে ফেলবে।'— মাস্টারজী হাই তুলছেন। সারাদিনের ধকলে এখন ক্লান্ত ঘুমার্ত হয়ে পড়েছেন। রাত এখন ১.২০ মিনিট। অরবিন্দ গৌরীকে ওঠার ইশারা করল। ওরা গুরুজীকে প্রণাম করে ওনার রুম পর্যন্ত গিয়ে বিদায় নিল।

বাবলি ঘুম থেকে উঠে পড়েছে, কিন্তু কাল রাত্রে যে মেয়েটা এসেছে সে গভীর ঘুমন্ত। বুকের উপর হাত ভাঁজ করে এক পায়ের উপর অন্য পা তুলে চিৎ হয়ে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা। বাবলির মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল— 'ও য়া..ও! হোয়াট অ্যা স্লিপিং বিউটি।' সশব্দেই বলেছে, তবুও মেয়েটার ঘুম ভাঙল না। গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসে বুক উঠছে নামছে। থাক, ঘুমোক, ওকে তো স্কুলে যেতে হবে না। গত রাতে বেশি কথা হয়নি, বলেছিল ইলেভেন ক্লাশে পড়ে। তার মানে ওর একবছরের জুনিয়ার। কী দারুণ সুন্দর দেখতে ওকে। যেমন লম্বা, তেমনি মজবুত পেটানো স্বাস্থ্য। ওর থেকে এক বছরের ছোট, কিন্তু কাল দেখে মনে হয়েছিল বড়। তবে কেমন যেন চুপচাপ। হাসেওনি একটি বার। কথাও কম বলছিল কাল।

ফ্রেন্ডশিপ করবে কিনা কে জানে! বাবলি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কুসুম ঘুম ভেঙে চোখ খুলে পায়ের দিকের দেওয়ালে লাগানো ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। একি! সাড়ে আটটা বাজে! জীবনে কোনও দিন এত বেলা অব্দি ঘুমোয়নি। রাত কাটেনি তেমনি ভোরে জাগার অভ্যাস চিরকাল। চারপাশটায় চোখ বুলিয়ে মনে পড়ল গতকালের কথা। ওই দেবতুল্য মানুষটি ওকে লখনৌ শহরে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। আঙ্কেল-আন্টি দুজনেই ডাক্তার। এরাও মনে হয় খুব ভালো মানুষ, তা না হলে নিজের মেয়ের কামরায় ওকে শুতে দেয়? এরকম গদিওয়ালা বিছানায় শুয়েছে বলেই ঘুম ভাঙেনি। এরা ধনী মানুষ হয়েও গরিব, গ্রামের মেয়েকে এতো সম্মান দিয়েছেন, যা ওর কল্পনাতীত। ও তো জানত বড়লোকেরা গরিবদের মানুষ বলেই মনে করে না। কিন্তু এরা তো একেবারেই অন্যরকম। বড় আশ্চর্য লাগছে ওর। আঙ্কেলরা দেবতুল্য মানুষটিকে গুরুজী বলে ডাকছেন। উনি তো বলেছিলেন উনি একজন শিক্ষক। অবশ্য শিক্ষকও গুরুই হন, তাই বোধহয় গুরুজী বলে সম্বোধন করেন! ওদের মেয়ে বাবলি নামজাদা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে, কিন্তু কাল রাতে কথা বলার সময় শুদ্ধ হিন্দিতেই কথা বলেছে। অহঙ্কার আছে বলে মনে হয়নি। ও ইংরেজিতে ভালোই নম্বর পেত, ইংরেজি কথা বুঝতে পারে, তবে বলতে একেবারেই পারে না। ভগবান বোধহয় একেবারে অকৃপন নন। তা না হলে আজকের সকাল ওর জীবনে এতো সুন্দর হয়ে আসার কথা নয়।

তাড়তাড়ি পাশেই শৌখিন বাথরুমে গিয়ে মুখ কুলি করে চোখেমুখে জল দিয়ে বেরিয়ে আসে ও। ওরা সবাই নাস্তা করছে, এটাকে ব্রেক-ফাস্ট বলে। প্রথমেই আন্টি বলেন, 'শুভ্ দিন বেটা।' কুসুমও উত্তর দিয়ে একে একে তিনজনকে প্রণাম করে বলে, 'মুঝে মাফ করেঙ্গে আপলোগ। মেরি নিন্দ নহী টুটি, ম্যায় শর্মিন্দা হুঁ।'

ওর পিঠে চাপড় মেরে গৌরী বলে, 'কোই বাত্ নহী বেটা। ভালো ঘুম হয়েছে, এখন ফ্রেশ লাগবে। তোমাদের বাথরুমের কাবার্ডে নতুন টুথব্রাশ আছে কয়েকটা, একটা নিয়ে ব্রাশ করে ফেলো। যাও, দেরি করো না, পরোটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

কৃতজ্ঞতায় মাথা নীচু করে কুসুম বলে, 'থ্যাঙ্ক ইউ আন্টি।' বলেই দ্রুত বাবলির রুমের দিকে চলে যায়। কী আজব ব্যাপার, আন্টি বাবলির রুমকে, বাথরুমকে 'তোমাদের বাথরুম' বলেন। ব্রাশ করতে করতে ওর প্রবল কান্না এলো। ঝরঝর করে ধারাপাত হতে লাগল দুচোখ থেকে। এসব কী সত্যিই ঘটছে নাকি ও দিবা স্বপ্ন দেখছে? এসব কী সত্যিই ওর মতো অভাগা, অনাথ মেয়ের জীবনে টিকে থাকবে? নাকি ক্ষণিকের জন্য বুদবুদের মতো ফুটে উঠেই মিলিয়ে যাবে? আন্টিরা ওর কলঙ্কিত হয়ে যাওয়ার বিষয়ে এখনও কিছু জানেন না নিশ্চয়, যখন জানবেন তখন কি ওকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন? ওনাদের পূজনীয় গুরুজীর সঙ্গে এসেছে বলে ভালো মেয়ে বলে ভেবেছেন। ও যে প্রকৃতই ভালো মেয়ে, ওকে যে জবরদস্তি কলঙ্কিত করা হয়েছে, সেকথা কি ওরা বুঝবেন? এরা যদি ওকে না রাখেন তখন গুরুজী ওকে কোথায় রাখার ব্যবস্থা করবেন?— প্রবল অনিশ্চয়তার দোলাচলে দুলতে থাকে ১৭ বছরের নিরপরাধ অসহায় মেয়ে কুসুম সিং।

মনের ভাবনা তো আলোর চেয়েও দ্রুত গতিতে ছোটে, বাথরুমে কিন্তু ও বেশি সময় কাটায়নি। ঝটপট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ডাইনিং রুমে ফিরে এসে গৌরীর কাজে সাহায্য করতে চায়— 'আন্টি, আমি খানা বানানো, ঘরের কাজ সব করতে জানি।'

— 'খুব ভালো কথা। আমিও তোমার মতো বয়স থেকে ঘরের সব কাজ করেছি। আমার মা'র অ্যাস্থমা মানে শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুখ ছিল, তাই ১০-১২ বছর বয়স থেকে কাজ করতে হয়েছে। তবে এখন তো আমি ঘরের কাজ করি না, আর রান্নাবান্না সব কাজেরই লোক আছে বেটা। আমি শুধু খানা পরিবেশনটুকু নিজে করতে ভালোবাসি, তাই ওটা করি। তোমাকে এসব কিছু করতে হবে না। তুমি নাস্তা করতে আরম্ভ কর।'

বাড়ি এখন খালি। গুরুজী হাতে সময় পেয়েছেন। ব্যাস! নাস্তা করেই কোনও তাগাদায় কোথাও ধর্না দিতে বেরিয়েছেন। গৌরী কুসুমকে পাশে নিয়ে বড় সোফায় গিয়ে বসলো ড্রইং রুমে। কোনও ভনিতা না করে বলল, 'বেটা, কাল রাত্রে তোমরা শুয়ে পড়ার পর অনেক রাত অবধি গুরুজী আমাদের কাছে তোমার সব কথা খুলে বলেছেন। তোমার উপর যে অবিচার হয়েছে, তার জন্য তুমি দায়ী নও। আমি তো একজন মা, আমি বুঝতে পারছি তোমার নিজের ভেতরে কত যন্ত্রণা চলছে। আজ তোমার উপর বলাৎকার হয়েছে, কাল বলা কি যায় বাবলির উপর হবে না? তোমার আঙ্কেল, আমি দুজনেই যে ডাক্তার তুমি সেটা জেনেছ। তাই তুমি সত্যিই প্রেগন্যান্ট কিনা সেটা আমি টেস্ট করলেই বুঝতে পারব। সে জন্য কবে ঘটনাটা ঘটেছিল, তোমার লাস্ট পিরিয়ডস কবে হয়েছিল, সেই তারিখগুলো আমাকে বল। অনেক সময় তোমার বয়সী মেয়েদের স্বাভাবিক কারণেও ২-৩ মাস পিরিয়ডস বন্ধ থাকে। পরে আবার হয়ে যায়। ভগবান করুন তোমার যেন সেটাই হয়। কিন্তু যেহেতু তোমার উপর বলাৎকার হয়েছে এবং পিরিয়ডস্ সময়মতো

হয়নি সেই হেতু প্রেগন্যান্ট হবার সম্ভাবনাও থাকতে পারে। আমি স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ গাইনোকোলজিস্ট বেটি। তুমি প্রথম দিন থেকে আজ অবধি সব কথা আমাকে বল নিঃসঙ্কোচে, মনে কর আমিই তোমার মা। আমি ডেট কাউন্ট করে ইউরিন টেস্ট করলেই জানতে পারব। রেপ-এর পর তোমার কি ৪০ দিন পার হয়ে গেছে পিরিয়ডস্ হয়নি। কত তারিখ রেপ হয়েছিল আর তারপর কত তারিখ তোমার ডেট ছিল সেটা বললেই বুঝতে পারব। বল বেটা, আমাকে বিশ্বাস করে বল। আমিই তোমাকে উদ্ধার করতে পারব।'

কুসুম কথা বলার আগেই কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। গৌরী ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে সাহস জোগাচ্ছিল। সময় দিচ্ছিল। একসময় কুসুম দোপাট্টা দিয়ে চোখের জল মুখে শক্তি জোগাড় করে সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে লাগল। কী করে কত তারিখ একা স্কুল থেকে ফেরার পথে বলরাজ মোটর বাইক নিয়ে ওর পথ আটকে ওকে টেনে নিয়ে গন্না ক্ষেতে নিয়ে গিয়েছিল। তারিখ, সময় সব বলল। গৌরী ক্যালকুলেট করে দেখল ঘটনা প্রায় আঠাশ দিনের পুরনো। অ্যাকুরেট টেস্ট রেজাল্ট ৪৫ দিনে পাওয়া যায়, ৪০ দিনেও মোটামুটি বোঝা যায়।

কুসুম বলছিল, 'আমার বাবা একজন মামুলি কিষান, বেশি জমি নেই, তবে যেটুকু আছে তাতে গুজারা হয়ে যায় কষ্ট করে। আমরা তিন বোন। ভাই নেই বলে বাবার মনে খুব আক্ষেপ দেখেছি। ভাই এনে দিতে না পারার জন্য মাকে সবসময় দোষী করত, শান্তি দিত না। মা আড়ালে কাঁদত। আমি ছোটবেলা থেকে লেখাপড়ায় আগ্রহী ছিলাম। একটু বড় হওয়ার পর ভাবতাম বাবার পাশে ছেলে হয়ে দাঁড়াবার মতো করে নিজেকে তৈরি করব আমি। আমাদের গ্রামে মিডল স্কুলের উপর আর স্কুল নেই। মিডল স্কুল পাশ করার পর পাশের গ্রামের এইচ এস স্কুলে ভর্তি হবার বায়না ধরলাম। বাবা রাজি হচ্ছিল না। প্রথমত, সেটা আমাদের গ্রাম থেকে ২ কিলোমিটার দূরে, দ্বিতীয় : পড়ার খরচের কথা ভেবে ভয় পাচ্ছিল। অনেক কান্নাকাটি করে রাজি করালাম। অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে দল বেঁধে হেঁটে স্কুলে যাওয়া-আসা করতে কোনও কষ্ট হতো না আমার। যাদের সাইকেল আছে তারা সাইকেলে যেত। স্কুলে পড়াশুনা, খেলাধুলায় ভালো ফল করে টিচারদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিলাম। তাঁরা বই-খাতা দিয়ে অনেক সময় সাহায্য করেছেন আমাকে। ক্লাশ টেন-এ ইউ পি বোর্ডে আমি ৯১ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করলাম, এই নম্বর এই স্কুলের ইতিহাসে আগে কেউ পায়নি। আমার কোনও প্রাইভেট টিউটর ছিল না, সকলেই জানত আমি একক চেষ্টায় পড়াশুনা করেছি। স্কুল পরিষদ খুশি হয়ে স্কুলের তরফ থেকে মাসিক ১০০ টাকা বৃত্তি দিলেন আমাকে। বললেন, ১২ ক্লাসের বোর্ডে যেন আরও ভালো রেজাল্ট করে তাদের এবং স্কুলের নাম রৌশন করি।.. নাম রৌশন করতে পারলাম না আন্টি, নাম বদনাম করে আজ আমি রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমার বাবা নিজে আমাকে ভরা সন্ধ্যেবেলা অন্ধকারে একটা বাস স্টেশনে পথে বসিয়ে রেখে পালিয়ে গেল। উনি আমাকে রক্ষা না করলে এতক্ষণে আমি বেওয়ারিশ লাশ হয়ে মর্গে পড়ে থাকতাম, না হলে হিউম্যান ট্র্যাফিকিং মাফিয়ার হাতে পড়ে ফ্লেশ ট্রেডিং-এ ঢুকিয়ে দিত।

গৌরী অবাক হয়ে বলে ওঠে— 'তুমি এসবও খবর রাখো? আমি ভাবতে পারিনি তোমার এতখানি নলেজ আছে! বাহ্!'

কুসুম বলল, 'অফ টাইমে নিউজ পেপার পড়তাম স্কুলে। বাড়িতে তো রাখা হতো না পেপার। আমাকে যে বাবার ছেলের শখ মিটিয়ে তার পাশে খুঁটির মতো দাঁড়াতে হবে। এডুকেশন, নলেজ, কেরিয়ারই যে আমার অব্যর্থ নিশানা ছিল। হিন্দি মিডিয়ামে পড়েছি, ইংরেজি বলতে পারি না, কিন্তু বুঝি মোটামুটি। শুধু পড়াশোনা করিনি, তার সঙ্গে যোগ ব্যায়াম, লাঠি চালনা, খেলাধুলা করে নিজেকে একটা ছেলের মতো তৈরি করার চেষ্টাও করেছি। পারিনি শুধু এই মেয়ে শরীরটাকে রূপান্তরিত করতে। যে পরিবার, যে বাবা-মার জন্য আমার তপস্যা ওরাই আমাকে সবচেয়ে বেশি বিট্রে করেছে আন্টি। আমি আর ওদের মাতা-পিতা বলে মনে করতে পারব না কোনও দিন। বলরাজ গুন্ডা, সে আমার আগেই গ্রামের তিনজনকে রেপ করেছে। ওর ভয়ে সকলেই কথাটা গোপন রাখতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু লাভ হয়নি। কারণ ওরা তিনজনই প্রেগন্যান্ট হয়ে সুইসাইড করে মরেছে। আমার পিতাও তো আমাকে সুইসাইড করার জন্যই বাস আড্ডায় ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। আমি মরতে চাইনি আগে কখনও, ভালোভাবে বাঁচতে চেয়েছি। জানি না আমার কী হবে।'

গৌরী কুসুমের হাতখানা ধরে ভরসার চাপ দিয়ে বলে, 'আপসেট হয়ো না বেটা। একটা দুর্ঘটনাতেই জীবনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার মতো দুর্বল মেয়ে তো তুমি নও। লড়াই করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছ এইটুকু বয়সে, দুর্ভাগক্রমে লড়াই জলদি এসে গেছে সামনে। তোমাকে তো এই লড়াই জিততেই হবে, স্কুলের পরীক্ষায় যেমন জিত হাসিল করেছ, তেমনি জীবনের পরীক্ষাতেও জিত হাসিল করতে হবে। ঈশ্বর তোমার কাছে ঠিক সময়ে গুরুজীকে এনে দিয়েছেন। জানো, গুরুজী হারতে জানেন না। বারবার বাধা পেলেও ধৈর্য ধরে একসময় সব বাধা অতিক্রম করতে জানেন তিনি। তুমি যখন তাঁর শরণে এসে পড়েছ, তখন জানবে তোমার আর কোনও ভয় নেই। তিনিই তোমাকে তোমার কাঙ্ক্ষিত মোকামে পৌঁছে দেবেন। এখন আমরা কাজের কথা বলব। তোমার

ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলার জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। প্রথমে বল ওখানকার স্কুল থেকে তোমার বাবা কি স্কুল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়েছিলেন? সেটাও কি তোমার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন?'

— 'টি. সি.? না তো! বাবা তো আর আমাকে পড়াবার ধান্ধা করেনি, যে টি.সি. নেবে। ঘরে বার্থ সার্টিফিকেট, টেনথ্ বোর্ডের অ্যাডমিট হল কার্ড, মার্কিশিট, আধার কার্ড আর ম্যাট্রিকের রেজাল্টএগুলোই ছিল, ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়ে লোকদেখানো ভালমানুষী করে বলেছে, যদি সুযোগ পাস তাহলে পড়িস! টি.সি. নিলে আমাকে বলতো। জানেন আন্টি, বাবা গ্রামে সবাইকে বলেছে রেপড্ হবার পর আমি আর বাড়িতে ফিরে আসিনি। কোথায় চলে গেছি বাবা জানে না। আমাকে নাকি খুঁজে চলেছে, কিন্তু পাচ্ছে না। ওদিকে বলরাজের চ্যালারাও আমাদের ঘরে ঘরে ঢুকে তল্লাশি করে গেছে। আমি তখন আমাদের বাড়ির পেছনে কচুরিপানা ভরা তালাউটাতে ডুবে থেকে প্রাণ বাঁচিয়েছি। ওরাও পায়নি, বাবা পাচ্ছে না আমাকে। তাই সবাই বিশ্বাস করেছে যে আমি ধর্ষণের লজ্জায় গ্রাম ছেড়ে কোথাও চলে গেছি। পরশুদিন রাত দুটোর সময় আমার লুকিয়ে থাকার জায়গা রসুই ঘরের মাচানের উপর থেকে নামিয়ে বলল, 'চল, আমাদের এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে। তুই এখানে থাকলে তোকে জিন্দা জ্বালাবে বলে বলরাজ ফতোয়া জারি করে দিয়েছে। বলরাজের চোখটাতে শূন্য একটা গর্ত ছাড়া আর নাকি কিছু নেই। ওরা তোকে না মেরে ছাড়বে না। আমি তোকে প্রাণে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। রাতের অন্ধকারে ক্ষেতের গন্নাগাছের আড়াল দিয়ে অনেক দূরে চলে যাবো। তারপর বাঁচলে অনেক কিছুই হতে পারে, মরে গেলে তো সব শেষ। তোর মা তো বলেছে তুই কাল বমিও করেছিস, তোর পেটে বাচ্চা এসে গেছে সন্দেহ হচ্ছে। এই অবস্থায় মাচানের উপর কতদিন থাকবি বল? আমরাই বা কী করব? তুই এখানে থাকলে সবাইকে যে মরতে হবে! আমি নিরুপায়। আয় দেরি হয়ে যাচ্ছে। তোর নসিবে থাকলে ভালও হতে পারে।'

— 'থাক কুসুম। ওসব যত ভাববে তত কষ্ট পাবে। তোমার পিতাজী যদি স্কুল থেকে টি.সি. নিয়ে তোমার সঙ্গে দিয়ে দিতো আর কোনও সমস্যা থাকতো না। তুমি আমার কাছে থেকে স্কুলে পড়তে পারতে। কিন্তু টি.সি. ছাড়া এখানে কোনও স্কুলে ভর্তি নেবে না। আমরা ডাক্তাররা টেষ্ট না করে কাউকে প্রেগন্যান্ট বলে ঘোষণা করি না। বমি করলে বা মাথা ঘুরালেই যে প্রেগন্যান্ট হয়ে যায় এমন নয়। তোমার রেপ হয়েছে বলেই তোমার মা সন্দেহ করেছেন। আমি সঠিক সময়ে টেস্ট করে দেখব। আচ্ছা, ধর যে তুমি সত্যিই প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়েছ, সেই ক্ষেত্রে তুমি কী চাইবে আমার কাছে? ঐ অবাঞ্ছিত বাচ্চা রাখতে চাইবে না ফেলে দিতে চাইবে? ওটা কিন্তু এখন কোনও আকৃতি নেয়নি, শুধুই একটা রক্তের ঢ্যালা অবস্থায় আছে।'

কুসুম শান্ত গলায় বলল, 'আমি তো চাইব আমার কিছু হয়নি এটাই আসুক টেস্টে।'

গৌরী ক্রস করে, 'আর যদি উল্টো হয়? বাচ্চা এসেছে ধরা পড়ে তখন কি চাইবে যে, মরতে মরতে বেঁচে যাওয়ার যে সুযোগ পেলে সেই সুযোগ নষ্ট হয়ে যাক? জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন হারিয়ে যাক একটা নাজায়েস বাচ্চা পয়দা করার মুর্খতার জন্য? তোমার ১৭ বছরের সুন্দর জীবনে একটা অঘটন ঘটে গেছে, সেই ঘটনার অভিশাপ কিছুটা তো এখনই টের পাচ্ছো, সারাজীবন ধরে এই অভিশাপ একা বহন করতে পারবে? আমরা বাচ্চার ভার নেব না।'

কুসুম মাথা নীচু করে বসে হাতের লম্বা করা নোখ খুঁটছিল। ওই অবস্থায় বসেই মৃদু স্বরে বলল, 'এ..এটা থাকলে ব...বলরাজের বদলা নিতে পারব, সবুত থাকবে, ওর সাজা হবে, ফাঁসির ফান্দায় লটকাতে চাই ওকে। আন্টি শুধু ভদ্র পরিবেশে থাকতে চাই, একটু আশ্রয়, একটু দয়া কর।'

গৌরী কঠিন গলায় বলল, 'না, কুসুম। তুমি তোমার বাবার চেয়েও বেশি স্বার্থপর। গুরুজী আর আমাদের ভালোমানুষ পেয়ে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছ। তুমি নিজের জন্য সব চাও, অন্যদের অসুবিধার কথা ভাবো না। আমার ছেলেমেয়ে এসব দেখে প্রশ্ন করবে, সেটা কেন মেনে নেব? এবর্ট করতে রাজি হলে ওরা বুঝতেই পারত না। তুমি গুরুজীর কথাও ভাবছ না। ওনার পরিবার আছে, গ্রামের মানুষ কত সম্মান করে তাদের। বলরাজকে সাজা অন্য ভাবেও দেওয়া যায়, তার জন্য তোমাকেই বহু বছরের পড়াশুনায় নিজেকে তৈরি করতে হবে। বাচ্চা কে পালবে?'

এই মেয়ে অত্যন্ত অ্যাম্বিশাস, গতকাল জীবনের কাছে হেরে গিয়ে সুইসাইড করার চেষ্টা করেছিল, ক্ষণিকের জন্য ইমপালসিভ্ হয়ে। আশ্রয় পেয়েই নিজের জেদ, দাবি প্রকাশ করছে। ও বুঝতে পেরেছে গুরুজী ঈশ্বর প্রেরিত দূতের মতো ত্রাণকর্তা হয়ে ওর জীবনে এসে হাজির হয়েছেন। ওর বাবা ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারত না, কিন্তু এখন সেই আশা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা প্রচুর। জাতে জাঠ এই মেয়ে কন্যাসন্তানের ওপর অত্যাচার দেখে বড় হয়েছে। এখন মুক্ত জীবনের হাতছানি পেয়েই ওর ইচ্ছে পূরণের ঠিকাদার মনে করছে আমাদের সবাইকে।

পরমেশ্বর শর্মার দিনটা আজ শুভ। অ্যাসেম্বলি হাউসের বাইরেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন কড়া রোদে, এমন সময় একটা গাড়ি একেবারে তার প্রায় গা ঘেঁষে এসে থামল। আর একটু

হলে হয়তো চাপা দিয়ে দিত। ড্রাইভারকে তিরস্কার করতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই পেছনের জানালা খুলে, 'আরে, শর্মাজী'— বলে উঠল কেউ। ফিরে তাকিয়ে দেখেন বিজয়েন্দ্র তিওয়ারি, ইউ-পির শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং।

উনি বললেন, 'এত রোদে দাঁড়িয়ে কার অপেক্ষা করছেন শর্মাজী?'

মাস্টারজী জানালার পাশে এসে অম্লান বদনে একটি মিথ্যে কথা বলেন— 'কার আবার? আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যই দশ নম্বরি পথে যদি ভেতরে যাওয়া যায় সেই চেষ্টাই করছিলাম স্যার।'

হেসে তিওয়ারিজী গাড়ির দরজা খুলে বললেন, 'উঠে আসুন।'— মাস্টারজী সঙ্গে সঙ্গে হাতে পাওয়া স্বর্গে উঠে বসে পড়েন। বিজয়েন্দ্রর সঙ্গে তার অনেক দিনের পরিচয়। তখন তিনি মন্ত্রী হননি, পার্টির প্রথম সারির নেতা ছিলেন। কত ব্যাপারে যে বিজয়েন্দ্র তাঁকে সাহায্য করেছেন ইয়ত্তা নেই। অতি অল্প সংখ্যক নেতা যারা আম আদমির সেবা করার আদর্শ মেনে চলে বিজয়েন্দ্র তাদের একজন। বিজয়েন্দ্রও জানেন, পরমেশ্বর শর্মা নিজের ছেলে, অন্য আত্মীয়, বন্ধু, স্বজন ইত্যাদিদের জন্য দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ান না। শর্মাজীও তার গ্রামের আম আদমির জন্য নিঃস্বার্থ সেবা বিলিয়ে দিচ্ছেন। বিজয়েন্দ্র পরমেশ্বর শর্মাকে পছন্দ করেন, শ্রদ্ধা করেন। কতবার তাঁকে নিজের পার্টিতে যোগদানের অনুরোধ করেছেন, কিন্তু শর্মাজী রাজি হননি। নাম, যশ, পদ— কিছুর প্রতিই এই ব্যক্তির আকর্ষণ নেই। এই নির্লোভ মানুষটি বিজয়েন্দ্রর মুষ্টিমেয় পছন্দের তালিকায় একজন।

পরস্পর সৌজন্য বিনিময়ের পর বিজয়েন্দ্র বললেন, 'আপনি ফোন তো করতে পারতেন।'

— 'ফোন যখন করতাম তখন আপনি দেশের সবচেয়ে বড় প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন না স্যার। এখন যার যে সম্মান প্রাপ্য তাকে সেটা অবশ্যই দিতে হবে। এসে দেখা করে আর্জি পেশ করতে হবে।'

মুগ্ধ বিজয়েন্দ্র বিনম্রভাবে বলেন, 'আপনাদের মতো গুটিকয় আদর্শবাদী মানুষ আমার শিক্ষাগুরু। এবার বলুন, কী জন্য দেখা করতে এসেছেন। তার আগে বলুন খাওয়া হয়েছে? শুনেছি না খেয়ে আপনি সারাদিন নাকি অপেক্ষা করতে পারেন, তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

মাস্টারজী মনে মনে ভাবেন— এসে তো ছিলাম হল্ট স্টেশনের মতলবে, ভগবান যখন তোমার সঙ্গে মোলাকাত করিয়ে দিলেন তখন গার্লস স্কুলের অ্যাফিলিয়েশনের আর্জি পেশ করার মৌকা ছাড়ব কেন? মুখে হাসি নিয়ে আবার অম্লান বদনে আর একটি মিথ্যে কথা বললেন— 'হ্যাঁ, সেই পরিস্থিতি কখনও হয়েছে বটে, তবে আজ লাঞ্চ করেছি। আপনি বিধানসভা ছেড়ে কোথায় চললেন?'

— 'আমি একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছি। যেতে যেতেই কথা হবে। আপনার সুবিধামতো জায়গায় নামিয়ে দিয়ে যাবো। এবার বলুন।'

কথা হলো। বিজয়েন্দ্র আশ্বাস দিলেন তিনি নিজে ব্যাপারটা দেখবেন। ওর আশ্বাস মানে বাদলা আকাশে সূর্য ওঠা। মাস্টারজীর মন ভরে গেল। এ যেন মেঘ না চাইতে জল। যথাস্থানে তাকে নামিয়ে দিয়ে মন্ত্রীর গাড়ি চলে গেল, তখন রিস্ট ওয়াচে চোখ দিয়ে দেখেন বেলা সাড়ে তিনটে বাজে। ছিঃ ছিঃ! গৌরীকে জানাবার সময়ই পাননি। না খেয়ে গুরুজীর অপেক্ষায় বসে থাকবে মেয়েটা। এখান থেকে অরবিন্দের বাড়ি অটো রিক্সাতে ১৫-২০ মিনিটের রাস্তা। তাড়াতাড়ি গৌরীকে ফোন করে বললেন, 'খেয়ে নাও। জানাতে না পারার জন্য দুঃখিত। আমি এসে সব বলব। আমার খাওয়া হয়ে গেছে, মা। তুমি অপেক্ষা করো না আর। খেয়ে নাও এখন।'— ফোন করে একটা চায়ের দোকানে এসে এক গ্লাস চা আর দুটো রাস্ক বিস্কুট নিয়ে চায়ে ডুবিয়ে খেয়ে নেন।

গৌরী জানে কোনও বিশেষ কাজে আটকে পড়েছেন গুরুজী, তা না হলে সময়মতো এসে পড়তেন খেতে, নয়তো দেরি হবে বলে জানিয়ে দিতেন। ও খায়নি বলে কুসুমও খেতে চাইচিল না। বকাবকি করে গৌরী ওকে লাঞ্চ খাইয়ে দিয়েছে। লক্ষ্য করছে সকালের আলোচনার পর থেকে কুসুম ঘাবড়ে গেছে, কিন্তু বলেনি— তাহলে এবর্ট করিয়ে দাও। উল্টে বকবক করেই চলেছে— কোনওদিন ওদের গ্রামের বাইরে কোনও শহর দেখেনি, আর এখন একেবারে লখনৌ সিটিতে এসে পড়ল! এরকম বাড়ি টিভিতে দেখেছে। এটা কী, ওটা কী সব জানার কৌতূহল আছে। কাজ করতে চাইছে, আমাকে শিখিয়ে দাও, আমি মাইক্রো ওভেনে খানা পাকাবো। ওয়াশিং মেশিনে কাপড়া ধোলাই করব— মানে সব কাজই ও করবে, গৌরীর আর লোকজন রাখার দরকার নেই যেন! ওর আন্তরিক হবার, ওদের কাছের মানুষ হবার প্রচেষ্টাকে গৌরী আমল দিচ্ছে না। ইচ্ছেটা প্রাণের ভেতর থেকেই আসছে বুঝতে পারছে গৌরী। কৃতজ্ঞতা শুধু মুখের ভাষায় নয়, কাজ করে, ওদের সেবা করে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে আশ্রয় বাঁচানোর জন্য। অন্য যে কোনও মেয়ে হলে তক্ষুনি রাজি হতো, এত বোঝানোর দরকারই হতো না। নিখর্চায় নির্ঝঞ্ঝাটে নিজের ভবিষ্যৎ বাঁচানোর এত ভালো সুযোগ হারাতে চাইত না। কুসুম মুর্খের স্বর্গে বাস করে। ও বলেছে কোনও হিন্দি ম্যাগাজিনে গল্প পড়েছে ওর মতোই এক মেয়ে রেপড্ হয়ে প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়েছিল। ও এক সুহৃদয় মানুষের কাছে আশ্রয় পেয়ে বাচ্চার

জন্ম দেয়। পরে কোর্ট-কাছারি হয় এবং ডি.এন.এ. টেস্ট করে রেপিস্ট ধরা পড়ে। সাজাও হয়। সে জন্যই ও নিজেও যদি অন্তঃসত্তা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে বড় হয়ে ওকালতি পাশ করে বলরাজের বিরুদ্ধে কেস লড়বে। বাচ্চার সঙ্গে ডি. এন. এ. টেস্ট করিয়ে বলরাজকে সাজা দেবে।— বা-বা-বা! কী চমৎকার ওর পরিকল্পনা। গুরুজী ওকে প্রাণে বাঁচিয়ে নোংরা হাতে পড়া থেকে রক্ষা করার জন্য মানবিকতা দেখিয়ে তো মহা ফ্যাসাদে ফেঁসে গেলেন বলে ভয় হচ্ছে গৌরীর। এই মেয়ে গল্পের নায়িকা হতে চায়। আর গুরুজীও তেমনি! বলে দিলেন ওর এবরশনের ব্যাপারে মতামত দেবেন না, ও যা চায় তাই হবে। অবশ্য তাঁকে দোষ দিয়ে লাভ কী? পরের উপকার করাই তো তাঁর ধর্ম, তাই তো ছাত্ররা গুরুজী বলে ডাকে তাঁকে। স্পিরিচুয়াল গুরু না হয়েও তিনি মানবিক সত্তার গুরু তো বটেই। গৌরী ভাবতেই পারছে না সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ চামেলী দেবী কুসুম সিং জাঠভের আঁতুড় তুলছেন স্বামীর আদর্শের খাতিরে! ধর্ষিতা বালিকাকে বাঁচিয়ে নিজের বাড়িত মাস্টারজী ঠাঁই দিয়েছেন এইটুকু হরিয়ালের মানুষ ভালো মনেই মেনে নেবে। কারণ, সবাই জানে মাস্টারজী জাত-পাতের ঊর্ধ্বে। কিন্তু কুমারী মেয়ে তাঁর বাড়িতেই সন্তান প্রসব করবে, অতো উদার কেউ হতে পারবে না এই ব্যাপারে গৌরী নিশ্চিত। গুরুজীকে হরিয়ালে আত্মমর্যাদা খোওয়াতে হবে একথা যে কল্পনাও করা যায় না। কী করে আটকাবো? কুসুমের ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছে ওর। জোর করেই ব্লাড ক্লটটাকে ফেলে দিয়ে ওকে সাফ করে হরিয়াল পাঠাবার ইচ্ছে হচ্ছে। এই মেয়েটা নাকি লেখাপড়ায় ভালো! বেশ তো, এখান থেকে সাফ হয়ে ওখানে গিয়ে পড় না বাবা! উকিল হতে চাস তো উকিল হ! তখন আমার বাড়িতে থেকে ওকালতি পড়িস না হয়। কিন্তু পেটে বাচ্চা নিয়ে গুরুজীর পরিবারে গিয়ে ওনাদের ইজ্জত নষ্ট করিস না মূর্খ মেয়ে।

না। আজ রাতে গুরুজীর সঙ্গে ওর তর্কাতর্কি কেউ আটকাতে পারবে না। কুসুমের প্রেগন্যান্সি ধরা পড়লে ওকে এবর্ট করেই হরিয়াল যেতে হবে, না করতে চাইলে ওকে কোনও নারী নিকেতনে পাঠাতে হবে। সেখানে গিয়ে বুঝুক ও কী হারিয়েছে নিজের জেদ আর বোকামির দোষে।

রাত্রে আগের রাতের মতোই ছোটরা চলে গেলে ওরা তিনজন বসে কথা বলছিল। গুরুজী বিজয়েন্দ্র তেওয়ারির কথা বললেন ওদের। খুশিতে ভরপুর লাগছিল ওনাকে। ওরা জানে স্কুল স্কুল করে গুরুজী কত ঘাম ঝরিয়েছেন, শরীরের কত রক্ত জল করেছেন। গার্লস স্কুল অ্যাফিলিয়েটেড হলে নতুন নতুন টিচার আসবে, অনেক বেকারের কর্মসংস্থান হবে। তাঁর মতো মানুষ খুশি তো হবেনই।

এসব কথা শেষ হতেই গৌরী আর দেরি না করে নিজের কথা পেড়ে ফেলল। —'গুরুজী এখানে কুসুমের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে আজ। কী আশ্চর্য, ও বেবি রাখতে চাইছে।' — তারপর ও সব কথা খুলে বলল। অরবিন্দ প্রচণ্ড রেগে বলল, 'মগের মুলুক পেয়ে গেছে নাকি? আমি কালকেই বলেছিলাম ও অকৃতজ্ঞ, সেলফিস হবে। গুরুজী মানলেন না। উনি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছেন ওকে। জানেন না তো আজকাল একটু প্রশ্রয় পেলেই সবাই মাথায় উঠে বসতে চায়। না-না। ওর সব আবদার মানা যাবে না। বাপ-মা রাখল না আর এখানে এসে গুরুজীর মানবিকতার দুর্বলতার ষোলোআনা সুযোগ নিতে চাইছে? এসব হবে না, ও এবার পথ দেখুক নিজে পথে নেমে।'

গৌরী বলল, 'আমি বলছি ওকে কোনও নারী নিকেতনে তো রাখা যায়। গুরুজী যে অত্যন্ত ভালোমানুষ এটা বোঝার বুদ্ধি ওর আছে, কিন্তু ম্যাগাজিনে পড়া গল্পের নায়িকা সাজবার শখ মেটানোর জন্য ত্রাণকর্তার উপর প্রেসার ক্রিয়েট করা যে অন্যায় সেটা বোঝার বুদ্ধি নেই নাকি? সব বুদ্ধি আছে ওর। ও জানে গুরুজী যখন ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন তার মানে এই হয় যে, উনি ওর সবরকম দায়িত্ব নিলেন। আর এই সুযোগটাই ও পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে চাইছে। বাপরে বাপ, ঐটুকু মেয়ের মাথায় কী পাকা বুদ্ধি, অ্যাঁ!'

অরবিন্দ বলল, 'হ্যাঁ, একদম ঠিক বলেছ। তুমি ওকে এখানেই রাখতে চেয়েছিলে, কিন্তু আমি ওকে এখন আর এখানে রাখার আগ্রহ হারিয়ে ফেললাম। ও হরিয়াল যাক এটাও আমার ইচ্ছে নেই। তুমি ঠিকই বলেছ, ওর জন্য গুরুজীর সম্মানহানি হবে আমাদের গ্রামে। তার চেয়ে ওকে এন. জি. ও.-র হাতে দিয়ে দেওয়া ভালো গুরুজী। আপনি আপত্তি করবেন না দয়া করে। আপনার যতখানি করার তা করেছেন, এর বেশি করতে যাবেন না। আমি কালই এন জি ও পরিচালিত ভালো destitute womens home-এর খোঁজ নেব। যতদিন না ব্যবস্থা হচ্ছে ও এখানে থাকুক। গ্রামে যাবার দরকার নেই।'

মাস্টারজী বুঝতে পারেন ওরা দুজনেই কুসুমের নির্বুদ্ধিতায় খুব রেগে গেছে। এটাও ঠিক যে অন্য হাজারটা মেয়ে এক বাক্যে রাজি হয়ে যেতো। কুসুম বোকার মতো অতি নাটকতা করে ফেলেছে। জীবনে এসে পড়া কঠিন বাস্তবকে ও এখনও ভালো করে উপলব্ধি করতেই পারেনি। কারণ, ওর চরম বিপদের ঠিক পূর্বক্ষণেই তিনি রক্ষাকারী হয়ে ঢুকে পড়েছিলেন নাট্যমঞ্চে। ও ধরেই নিয়েছে মাতা-পিতার শূন্য স্থানটাকে তিনিই কর্তব্যপরায়ণ হয়ে পূর্ণ করে দেবেন। এটা ওর অল্প বয়সের দোষ, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে পরিচয় না থাকার কারণ। সে জন্যই ও প্র্যাকটিক্যাল হতে পারছে না, কল্পলোকে

ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষা। বললেন— 'আমার জায়গায় তুই থাকলে তখন তুইও এতশত ভাববার অবকাশ পেতিস না অরবিন্দ। তোরও মনে হতো কতক্ষণে ঐ বাস টার্মিনাসের থেকে দূরে মেয়েটাকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় যেতে পারবি। মনে হতো একটা শকুনে খেয়েছে, এবার একশোটা চিল-শকুনে মিলে ছিন্নভিন্ন করে মেরে ফেলবে। তোর আমার মতো মানুষরা নির্বিকার থাকতে পারে না রে! আমরা ডুবন্তকে বাঁচাবার জন্য আগে জলে ঝাঁপ মারি। যাই হোক, কুসুম নির্বোধ, আমরা তো নির্বোধ নই। বহু-মা কাল বলেছিল না যে মেয়েটারও তো জীবন সংশয়। আমার কিস্তি মাত করে দিয়েছিল। দ্যাখ, কিছু না ভেবেই ইমপালসিভলি নিয়ে যখন চলে এসেছি, তখন কী করে আর দায়িত্ব এড়িয়ে যাবো গলার কাঁটা ভেবে? আমি জানতাম না পারফেক্ট রেজাল্ট পাবার জন্য ৪৫ দিন অপেক্ষা করতে হয়। ধারণা ছিল বহুর কাছে নিয়ে এলেই সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারব মেয়েটা অন্তঃসত্তা হয়েছে না হয়নি। ৪৫ দিন হতে এখনও ১৭ দিন বাকি। আমি ভাবছি, এখন ওকে নিয়ে বাড়িতেই যাওয়া উচিত হবে। ১৭ দিন পর নিয়ে আসব। ততদিনে চামেলী চাচি ওর মাথার ভূত নামিয়ে এবরশনের জন্য রেডি করে ফেলবে। বুঝলি তো?'

গৌরী-অরবিন্দ দুজনেরই অপরাধবোধ হচ্ছিল। ওরা কুসুমের প্রতি বেশি কঠোরতা প্রকাশ করে ফেলেছে। গুরুজী হয়তো নারাজ হয়ে চলে যেতে চাইছেন। গৌরী বলল, 'এই ১৭ দিন ও এখানেই থাকুক না। নিয়ে যাবে আবার নিয়ে আসবেন, সেও তো ঝামেলা। আমিই পারব ওকে বোঝাতে।'

— 'না বহু, এটা তোমার কর্ম নয়। দু-পাতা পড়েছে বলেই ও সবজান্তা হয়ে যায়নি। ও জীবনে প্রথম বাসে চড়া, একেবারে কাঁচা গ্রাম্য মেয়ে। তোমার মতো স্পেশালিস্ট গাইনোকোলজিস্টের ভাষা ও বুঝবে না। ওর জন্য তোমাদের চাচিজীর দরকার, তিনি কাঁচা গ্রাম্য ভাষায় বুঝিয়ে দেবেন ও কেমন অকূল পাথারে পড়েছে! যে বিষের জন্য যে ওঝার দরকার তার কাছেই নিয়ে গিয়ে ফেলব। কাল লাঞ্চ খেয়ে বেরিয়ে পড়ব।'

স্ত্রী চামেলী দেবীর ওপর পরমেশ্বর শর্মার অগাধ বিশ্বাস। স্বামীর আদর্শে বিশ্বাসী সহধর্মিণী চামেলী। লেখাপড়া জানেন, ম্যাট্রিক পাশ। বাইরে কোথাও গেলে প্রতিদিন বেশি রাতে ফোন করেন স্ত্রীকে। রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটা শহরের না হলেও গ্রামের মধ্যরাত্রি। চামেলী জানেন, তার ভবঘুরে পতিদেবের এই সময়ের আগে ফোন করার সময় হয় না, তাই তিনি অপেক্ষা করে থাকেন টিভি-র সামনে বসে। গৌরী-অরবিন্দ দুজনেরই কাল ডিউটি আছে। ওরা শুতে চলে যাবার পর পরমেশ্বর নিজের কামরায় গিয়ে স্ত্রীকে ফোন লাগালেন। গত রাতেও কথা বলেছেন, কুসুমের উল্লেখও করেছেন, বাকি কথা এসে বলবেন বলেছিলেন। কিন্তু এখন শিডিউল চেঞ্জ হয়ে গেল, তাই কাল গ্রামে যাবার আগে আজই চামেলীকে সব জানিয়ে দেওয়া সমীচীন হবে। চামেলী খুবই বুদ্ধিমতী, ওর উপস্থিত বুদ্ধির তুলনা নেই। বহুবার ওর পরামর্শ মেনে চলার জন্য পরমেশ্বর উপকৃত হয়েছেন।

প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে সবিস্তারে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিলেন এবং কালই কুসুমকে নিয়ে বাড়ি চলে আসবেন জানালেন। চামেলী নীরবে বিনা প্রশ্নে সব শুনলেন, তারপর স্বামীর বলা শেষ হতেই জীবনে যা করেননি, এবার সেটা করে ফেললেন। তিরস্কারের সুরে বললেন— 'উফ্! আপ ভী না কভি কভি লা-পরওহা, বে-সমঝ হো যাতে হ্যাঁয়। রাস্তে কা কচড়া উঠা কর ঘর লে আ রহেঁ হ্যাঁয়। লড়কি পেট মে হ্যায়, অব উসকো লে কর গাঁওবালে হমারে মুহ পর থু-থু করেঙ্গে। আচ্ছা লাগেগা আপকো? ছোড়ো। শুনিয়ে জরা ধ্যান সে, আপ কতেউ উসকো লে কর দিন দাহাড়ে গাঁও মে নহী পাধারনা। ম্যায় চাহতি হুঁ মেরে পহলে ঔর কোই ভী উসকি সকল (চেহরা) না দেখেঁ। আপ রাত কা অন্ধেরে মে গাঁও মে আইয়ে। লড়কি কো কহনা বো আপকে সাথ সাথ না চলে, পিছে পিছে আয়ে। সমঝ গয়েঁ না?'

পরমেশ্বর বললেন, 'হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি। এটাও বুঝতে পারছি যে এবার একটা গর্হিত কাজ করে ফেলেছি, যার জন্য অরবিন্দরাও বিরক্ত আর তুমিও বিরক্ত হলে। কী করব? ফেলে আসতে বিবেকে বাধলো আমার।'

— 'আপনার মাত্রাধিক বিবেকবোধের জন্য পুরো পরিবারকে বিশেষ করে আপনার এতকালের তপস্যালব্ধ ইজ্জত না হারাতে হয়, সেটাই চিন্তার বিষয়। প্রকাশ-বিকাশরা এটা ভালোভাবে নেবে না। আমার সংসারে না ভাঙন ধরে। সমাজে হুক্কা পানি না বন্ধ হয়ে যায়!'

ফোন বালিশের পাশে রেখে দুহাত কপালের উপর ভাঁজ করে শুয়ে থাকেন চুপচাপ। জীবনে বহু বাধা অতিক্রম করেছেন পরমেশ্বর, কাজে সফল হতে না পারলে হতাশ হননি, কখনও মন খারাপ হয়নি তাঁর। কিন্তু আজ প্রথম মন খারাপের অনুভূতি উপলব্ধি করছেন। মনে হচ্ছে কুসুমকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা যেন অপরাধ হয়ে গেছে। প্রিয় ছাত্র, প্রিয়তমা স্ত্রী— কেউ তাকে আর

সুনজরে দেখছে না, সবাই এই মামলা থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারলে যেন বাঁচে। দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনে চামেলীকে এমন অশান্ত হতে দেখেননি, এমন তীক্ষ্ণ ভাষায় কথা বলতে শোনেননি। বুঝতে পারছেন ওরা সকলেই ধর্ষিতা কুসুমের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে রাজি, কিন্তু পেটে বাচ্চা থাকার সমস্যা ওদের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে, এই আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। হরিয়ালের বাড়িতে কুসুম খুব সুখে যে থাকতে পারবে না সেটা পরিষ্কার। শুধু চামেলী নয়, ছেলেরাও বিপক্ষে যাবেই, বিশেষ করে বড় ছেলে প্রকাশ আর ওর নববিবাহিতা বউ। ভুলই করে ফেললাম। আর ওই মেয়েটাও ঠ্যাটা। যার গাছের তলায় থাকার স্থান নেই সে রাজমহল চায়। বাচ্চা পয়দা করে বলরাজকে শাস্তি দেবে! যত্তসব বেওকুফি বুদ্ধি।

সারারাত নির্ঘুম মাস্টারজী অনেক অ্যাঙ্গেল থেকে চিন্তা করে অবশেষে বোঝেন, অন্যদের কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, দোষী তিনি নিজে আর ওই কুসুম। আদর্শবাদের মূল্যে নিজের আপনজনদের পর করে দিতে চলেছেন তিনি। সকলের চিন্তাধারা তাঁর মতোই হতে হবে, এটা তো হতে পারে না। আর কুসুমেরও সব আবদার তাঁকে মেনে নিতে হবে এমন প্রতিশ্রুতি তিনি দেননি তাকে। তাই এবার তাঁকেই কুসুমকে পথে আনতে হবে, স্পষ্ট ভাষায় সোজাসুজি বলতে হবে— 'তুমি এখানে থাকতে পারবে, লেখাপড়ার সুযোগ পাবে, কিন্তু একটা শর্তে। বাচ্চার দায়িত্ব আমি নেব না। এটা তোমাকে গিরাতে হবে।' কুসুম রাজি হলে ভালো, তা না হলে ওকে যেখান থেকে এনেছিলাম সেখানেই ফেরত যেতে হবে। এতে হয়তো তাঁর প্রিন্সিপল নষ্ট হবে, কিন্তু একজনের ব্যক্তিগত ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করে প্রিন্সিপল রাখতে গিয়ে দশজনকে বিপাকে ফেলা তো আরও বড় অধর্ম।

সেই দশজন কোন অপরাধে দুনিয়ার সামনে শির নীচু করবে? কুসুমও নিরপরাধ, তাই তিনি কুসুমের সহায়ক হতে আগ্রহী হয়েছিলেন, কিন্তু এখন তো ও তাঁর সততাকে দুর্বলতা বলে ভাবতে শুরু করেছে বলে মনে হচ্ছে। এটা হতে দেওয়া যাবে না। তাঁকে শক্ত হতে হবে। কুসুমও বাঁচুক আর তার নিজের পরিবারও বাঁচুক— এটাই তাঁর লক্ষ্য থাকা উচিত। কেউই যেন জবরদস্তি করে অধিকারের সীমা লঙ্ঘন না করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কাল যাবার সময় পথে যেতে যেতে কুসুমকে বলে দিতে হবে যে, সে তাঁর অনুগ্রহে পালিত হতে যাচ্ছে, তাই ওকে নিজের স্থান সম্বন্ধে সচেতন থেকে তাঁর পরিবারের অনুশাসন মেনে চলতে হবে।

সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যে অরবিন্দের বাড়ি খালি হয়ে যায়। ছেলে-মেয়ে স্কুলে যায়, ওরা দুজন হাসপাতালে। সর্বক্ষণের কাজের মহিলা কান্তা মৌসি অতিথির দেখাশুনা খুব ভালোভাবে করতে জানে। পরমেশ্বরকে কান্তাও গুরুজী বলে ডাকে বাড়ির অন্যদের অনুকরণে। দুপুরে লাঞ্চের পর একটু ঘুমিয়ে নিলেন মাস্টারজী। বিকেল চারটেয় রওয়ানা হবেন বলে দিয়েছেন কুসুমকে। — 'তৈয়ার রহনা। হম চার বাজে চল পড়েঙ্গে।'

কুসুম মাথা হেলিয়ে বলেছে— 'জী। তৈয়ার রহুঙ্গী।'

মাত্র দু'দিন আগের মতো সেই চৌরাহা-চৌক। সেই আসন্ন রাত্রির লগ্নে এসে নামলেন বাস থেকে। কুসুম নেমেই

জিজ্ঞেস করে— 'এটা সেই জায়গা তাই না বাবাজী?'

— 'হাঁ বেটা। এটা সেই জায়গা, যেখান থেকে তোমার নতুন জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছে মাত্র দুদিন আগে। চলো, আগে টিকিট কেটে আনি, এসে এই বেদীতেই বসব। তোমার সঙ্গে অনেক কথা বলার আছে আমার। এখানে বসে বলব।'

ফিরে এসে প্রিয় জায়গায় হাইওয়ের দিকে পেছন করে কুসুমকে নিয়ে বসলেন। তারপর বলতে আরম্ভ করলেন— 'এই জায়গায় তোমার পিতাজী তোমাকে অকূল সাগরে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। আমি তোমাকে সাহারা দিতে চেয়েছি, আজ তোমাকে নিজের ঘরে নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে আমার পত্নী, ছেলে, পুত্রবধূ আছে।' — এইভাবে বলা আরম্ভ করে লখনৌয়ে গৌরীর কাছে শোনা কথার সূত্র ধরে মাস্টারজী ওকে যারপরনাই বোঝাবার চেষ্টা করে যখন শেষ করলেন তখন ওনার বাস ছাড়ার মাত্র তিন মিনিট বাকি। ওঁর শেষ কথাগুলো ছিল— 'তুমি যদি আমার কথা না শুনে অবাধ্যতা কর, তাহলে এখানে থেকে যাও। নিজের ভবিষ্যৎ নিজের চেষ্টাতে গড়ে নিও। তোমার বাবা যদি চলে যেতে পেরেছে, তাহলে আমি কেন পারব না? তুমি তো আমার কেউ নও! আমি আমার বাস ধরে চলে যাবো।' — বলে ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন।

ব্যাস! যে কুসুম আধঘণ্টা ধরে নির্বাক থেকে কথা শুনছিল, সেই মেয়ে — 'না, না' বলে আর্তনাদ করে মাটিতে বসে মাস্টারজীর পা জড়িয়ে ধরে।— 'মুঝে ছোড় কর আপভী মত্ চলে যাইয়ে বাবাজী। ম্যায় বচন দেতী হুঁ, আপলোগোঁকা হর এক কহনা শুন কর রহুঙ্গী। মুঝে সাথ লে চলিয়ে, অকেলা মত্ ছোড়িয়ে।'

— 'চলো ওঠো। বাস এসে পড়েছে।'

বাসে জানালার দিকের সিটে বসে বারবার দোপাট্টা দিয়ে চোখ মুছতে থাকে। তারই মধ্যে বলতে থাকে— 'একিন মানিয়ে, ম্যায় ইতনী বুরি লড়কী ভী নহী হুঁ বাবাজী। গলতিয়াঁ কর সকতি হুঁ লেকিন বুরি কতেউ নহী। বুজুর্গো কো মান্যতা দেনা জানতি হুঁ। কৃপয়া মেরে উপর ভরোসা রখিয়ে, ম্যায় উন লোগোঁকা আজ্ঞা পাল্‌কর চলুঙ্গী। ভগবান কসম। আপকা কসম বাবাজী।'

মাস্টারজী আবার নরম হয়ে পড়ে পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে থেমে যান। না থাক। একটু ভয় পাওয়া ভালো।

হাইওয়েতে নেমে তিন কিমি হেঁটে বাড়ি যেতে যেতে রাত দশটার ওপর হয়ে যাবে। তার উপর সঙ্গে কুসুম আছে, এ পথ ওর অচেনা। পদে পদে হোঁচট খেতে পারে। এই সময় গ্রামের রাস্তায় লাঠিয়াল গ্রামরক্ষীরা ছাড়া আর কেউ থাকে না। তবুও চামেলীর কথা মতো উনি কুসুমকে বলেছেন, দোপাট্টা দিয়ে মাথা ঢেকে তার পেছন পেছন চলতে। কুসুম সেরকমই করছে। গ্রামে ঢোকার পরই দূর থেকে টর্চের আলোর সংকেত এবং সঙ্গে আওয়াজ ভেসে এলো— 'কৌন যাঁয়ে?'

মাস্টারজী নিজের টর্চের সংকেত দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, — 'মাস্টারজী পরমেশ্বর শর্মা।

—'ও, পাও লাগুঁ মাস্টারজী।'

বাড়ি পৌঁছতেই চামেলী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে জিজ্ঞেস করলেন— 'প্রকাশরা শুয়ে পড়েছে তো?' — কুসুম নত হয়ে প্রণাম করছিল দুজনকেই।

—'হ্যাঁ। আপনি পাতকুয়ায় চলে যান, ও কলঘরে যাক। খাবার গরমই আছে। তুমি আমার সঙ্গে এসো, তোমার ব্যাগ নিয়ে। তোমার কামরা দেখিয়ে দিচ্ছি। ব্যাগ রেখে কলঘরে চলো। হাতমুখ ধুয়ে আসবে।'

ছোট কামরাটাতে তক্তোপোশে পরিষ্কার বিছানা পাতা। টেবিল ফ্যান আছে, দুদিকে দুটো জানালা খোলা। ঘরখানা ভালো। কুসুম ব্যাগ থেকে ওর গামছা বের করে নীরবে চামেলীকে অনুসরণ করে। বাথরুম থেকে বের হয়ে দেখে, উনি বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন। ততক্ষণে পরমেশ্বরও গা ধুয়ে চলে এসেছেন এদিকে। চামেলী কুসুমকে নিয়ে নিজেদের কামরায় এসে বললেন— 'তুমি গ্রামেরই মেয়ে অন্য একটা গ্রামে এসে পড়েছ সম্ভবত পেটে বাচ্চা নিয়ে। গ্রামের মানুষ কেমন হয় তুমি ভালো করেই জানো। এখন আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি, সেটা দেখে তুমিও বিস্মিত হবে, উনিও হবেন। কিন্তু তোমার এবং আমাদের ইজ্জত বাঁচানোর এছাড়া আর কোনও পথ নেই। তোমাকে সাদী-সুদা সুহাগনের বেশে থাকতে হবে। আমি যা শিখিয়ে দেব, সেই কথা বলতে হবে, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে। দেখি, হাত দুটো বাড়াও।'

কুসুম নীরবে হাত বাড়িয়ে দেয়। চামেলী নিজের চুড়ির বাক্স থেকে একগাছা কাঁচের চুড়ি বের করে ওর হাতে পরিয়ে দেন। তারপর লাল বিন্দির পাতা থেকে একটা বিন্দি নিয়ে কপালে লাগান। সবশেষে সিঁদুরের কৌটা থেকে এক টিপ সিঁদুর আঙ্গুলে ধরে ওর সিঁথিতে লাগিয়ে বলেন— 'এটা তোমার আর আমাদের রক্ষা কবচ। প্রতিদিন স্নান করে এসে সিন্দুর লাগাতে ভুলবে না। কারণ, তুমি সকলের নজরে সাদীসুদা আউরত হয়ে থাকতে পারলে এই গাঁওয়ে তুমিও বাঁচবে, আমরাও বদনামের হাত থেকে বাঁচব।'

— 'এবার তোমাকে কী বলতে হবে মন দিয়ে শোনো। তুমি বাবার একমাত্র মেয়ে। মা আগেই মারা গেছে। তোমার বাবা মাস্টারজীর বন্ধু ছিলেন। তুমি স্কুলে পড়াশুনা করছিলে, এগারো ক্লাশে পড়ার সময় তোমার বাবার ক্যান্সার হয়। উনি মারা গেলে তোমার কী হবে ভেবে বাবা তোমাকে সাদি করে

দেন। পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। সাদির পর শ্বশুরাল আরও দেহেজের দাবি করে চাপ দিতে থাকে তোমার অসুস্থ বাবাকে। আর তোমাকে মারধর অত্যাচার করতে শুরু করে। অবস্থা চরমে ওঠে যখন টাকা না দিলে তোমাকে পুড়িয়ে মারার ধমকি দেয় তখন। তোমার বাবা তোমাকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন। ওরা তোমাকে আর নেবে না বলে দিয়েছে। এদিকে তোমার বাবারও শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে। তখন তিনি মাস্টারজীকে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। কারণ দোস্ত মাস্টারজী ছাড়া আর কেউ নেই যার কাছে তিনি তোমাকে রেখে যেতে পারেন। মাস্টারজী গেলেন আর তোমার বাবা অমৃতলোকে চলে গেলেন। তোমাকে চৌথার শ্রাদ্ধ করিয়ে মাস্টারজী এখানে নিয়ে এসেছেন। শোনো, আমি ছাড়া এই বাড়ির আর কেউ মানে আমার ছেলে-বহু ওরাও কেউ তোমার কথা জানে না। ওরা জিজ্ঞেস করলেও এই গল্পটাই বলতে হবে তোমাকে। শ্বশুরালে মাত্র চার মাসই ছিলে তুমি, তার মধ্যেই এত ঘটনা ঘটেছে। পেটে বাচ্চা এসেছে কিনা আমরা তো এখনও জানি না, তাই একথা আগবাড়িয়ে কাউকেই বলতে যেও না। কী? বলতে পারবে তো?'

— 'জী।' কুসুম মাথা নীচু রেখে বলে।

— 'তাহলে গল্পটা একবার আমাদের শোনাও।'

কুসুম আস্তে আস্তে বেশ গুছিয়ে গল্পটা পুরো বলতে পারে। চামেলী বলেন— 'হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। কোন গ্রামের মেয়ে, কোথায় বিয়ে হয়েছিল জিজ্ঞেস করলে নিজের গ্রামের নাম আর কাছাকাছি অন্য কোনও গ্রামের নাম বলে দিও। নিজের জাত লুকিও না, বলবে জাঠভ। ঠিক আছে?'

— 'জী।'

এরপর চামেলী ওদের রাতের খাবার দেন। নিজেও খান। কুসুম ওর কামরায় চলে যাবার পর স্বামীকে বলেন— 'এই গল্পটা শুধু ওর জন্য নয়, আপনার জন্যও।'

পরমেশ্বর বলেন— 'বুঝতে পেরেছি। তুমি ছাড়া আমার গতি নেই।'

— 'কাল রাতে আপনাকে কড়া কথা বলেছি এর জন্য ক্ষমা চাইছি।'

— 'তখন মন খারাপ হয়েছিল। তুমি কোনওদিন কড়া কথা বলোনি তো। কিন্তু তোমার কথায় আমার হুঁশ ফিরেছে। আজ আসার সময় আমি ওকে সোজাসুজি বলতে পেরেছি ওর বাচ্চার দায় আমরা নেব না।'

— 'বেশ করেছেন। আমি আজ ওকে গল্প শিখিয়েছি, কাল থেকে কুমারী মেয়ের মা হওয়ার আতঙ্ক কাকে বলে শেখাব। ও নিজে বাচ্চা ফেলার জন্য পায়ে পড়বে। দেখে নেবেন। অনেক রাত হলো, এবার শুয়ে পড়ুন। আমি পা টিপে দিচ্ছি।'

ঘুম ঘুম গলায় মাস্টারজী বললেন— 'চামেলী, তুমি তো মনোরমা হিন্দি ম্যাগাজিন পড়, ওতে গল্প লিখে পাঠাও না কেন?'

— 'আমি গল্প লিখব? আমার কি সেই মেধা আছে? ওকে যা বলেছি সে তো পান্তাভাতের মতো সবাই খায়।' — মাস্টারজী ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রকাশ-অল্‌কারা তো বিস্ময়ে হতবাক। কাল রাতে বাবুজী ফিরেছেন, যত রাতেই হোক সেটা নাহয় বুঝল, কিন্তু তাঁর সঙ্গে একজন অপরিচিত বৌও এসেছে এটা বুঝতে পারল না।— 'এ কে মা? আগে তো কখনও দেখিনি ওকে?'

চামেলী বললেন, 'সব বলব পরে। আমিও তো দেখিনি। তোদের বাবুজী কাল বেশি রাতে ফিরে এলেন একে সঙ্গে নিয়ে। আমাকে শুধু বললেন, ওর থাকার ব্যবস্থা করে দাও। আমার এক বন্ধুর মেয়ে। অত্যন্ত বিপাকে পড়ে ওকে নিয়ে আসতে হয়েছে। এখন এখানেই থাকবে। উপায় নেই। কাল সব বলব। এইটুকু বলে খেয়ে শুতে চলে গেলেন।'

প্রকাশ বলল, 'বাবুজী যখন নিয়ে এসেছেন তখন নিশ্চয়ই খুবই সমস্যা ছিল। যাই হোক, পরে জানা যাবে।'

— 'হ্যাঁ। আমিও তাই কাল রাতে আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। দুজনই খুব ক্লান্ত ছিল তো'

— 'ভালো করেছ।'

প্রকাশের বৌ অলকা নতুন বৌ। সে শুনলো, কিন্তু কোনও উক্তি করল না। ওর নবাগতের এই বাড়িতে আগমন ভালো লাগেনি। সাদিসুদি আউরত একা কেন এসেছে? বয়স তো নিতান্তই কম, আউরত বলা যায় না, লড়কিই বলা ভালো। তার উপর এ যে অনন্য রূপসী। ওর নিজের রূপ এর সামনে ম্লান। মাতাজী বললেন, এখানেই নাকি থাকবে। কেন? ওর পীতহর, শ্বশুরাল নেই নাকি? ঈর্ষার একটা ফুলকি। অল্‌কার বুকে জ্বলে ওঠে চিন্ চিন্ করে জ্বলতে লাগল। চামেলী কুসুমকে ডেকে এনে পরিচয় করিয়ে দিলেন— 'এ হলো আমার বড় ছেলে প্রকাশ। তুমি ওকে বড়ে ভাইয়া বলে ডাকবে। আর এ আমার নয়ী দুলহন, প্যারি বহু-মা। তুমি ভাবিজী বলবে। ওর নাম কুসুম।'

কুসুম দুজনকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সকাল বেলার সময়, সংসারে শতেক কাজ, প্রকাশ স্কুলে যাবে, ওর খাবার বানানো, সকলের নাস্তা বানানো চামেলী একাই করেন। নতুন বৌকে এসব কাজে লাগাননি এখনও। পরে সারা জীবন তো করতেই হবে। কুসুম নরম গলায়

ভয়ে ভয়ে বলে, 'আমি সব কাজ করতে পারি। আমাকে কিছু কাজ করতে দেবেন? রসুই ঘরে ঢুকবো না, আমি তো ওবিসি, আপনি অন্য যা করতে বলবেন করব।'

চামেলীর ভালো লাগল ওর সাহায্য করার আগ্রহে। বললেন, 'রসুই ঘরেও আসতে পারো। আমরা নামেই ব্রাহ্মণ, এ বাড়িতে জাতপাত মানে না কেউ। তুমি তাহলে আমাকে আটা মেখে সবজিগুলো কেটে দিও।'

কুসুমের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ছটফটিয়ে বলে, 'হাত ধুয়ে আসছি মাজী।'

কুসুম চলে যেতেই অল্‌কা বলে, 'ও চৌকা তে ঢুকবে? কেন মাজী? আমি করে দিচ্ছি।'

চামেলী বুঝতে পারেন নতুন বৌ কুসুমকে প্রতিরোধ করতে চাইছে। ওখানে একটা ঝড়ের সংকেত পাচ্ছেন তিনি। কিন্তু তাকে শক্তহাতে হাল ধরে সংসার বৈতরণী পার হতে হবে। প্রশ্রয় তিনি কাউকেই দেবেন না। বৌকেও না, কুসুমকেও না। মুখের গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বৌকে বললেন, 'আমাদের সাফ-সাফাই যে করে হরিয়া, সেও চৌকা (রসুই ঘর) সাফ করতে ঢোকে বহু। কুসুম কেন ঢুকবে না? তোমার শ্বশুর জাতপাত নিয়ে কথা বলা পছন্দ করেন না। আমরা কেউই করি না। তাছাড়া মেয়েটা যখন এখানেই থাকবে, তখন অযথা বসে থাকবে কেন? ও তো মেহমান নয়। তুমি বরং পুজোর ঘরটা পরিষ্কার করে ফেল। তার আগে বিছানাগুলো তুলে বাবুজীর জামাকাপড় বের করে রাখো। প্রকাশের সব জিনিস গুছিয়ে রাখো। সে তো বের হবে।'

এভাবেই শুরু হলো ব্যালান্সিং, চামেলীর ট্র্যাপিজের খেলার সার্কাস। অল্‌কা অবস্থাপন্ন ঘরের বিএ পাশ শহুরে মেয়ে। চামেলীর বানানো কুসুমের বিপর্যস্ত জীবন ইতিহাস এখন সকলেই জানে, এমনকী গ্রামের মানুষও। একমাত্র অল্‌কা ছাড়া অন্য সকলেরই এক সপ্তাহের মধ্যে অসহায় মেয়েটার প্রতি সহানুভূতি জেগেছে। প্রণম্য মাস্টারজীকে সবাই ধন্যবাদ দিয়েছে কুসুমকে আশ্রয় দেবার নিমিত্ত। স্কুল কমিটি ওকে ভর্তি করার ব্যাপারে মাস্টারজীর অনুরোধ এককথায় মেনে নিয়েছে। একমাত্র অল্‌কা কিছুতেই ওকে মেনে নিতে পারছে না। গত এক সপ্তাহে অন্তত সাতাশবার কুসুমের দোষ খুঁজে খুঁজে শাশুড়ির কাছে লাগানো হয়ে গেছে। চামেলী এসবে আমল দিচ্ছেন না। তিনি তো দুজনকেই দেখছেন। আজ সাতদিনের মধ্যে কুসুমের কাছ থেকে ভাবির বিরুদ্ধে অসন্তোষের আভাসও আসেনি। সে ঘরের কাজে কর্মে সারাক্ষণ মাজীকে সাহায্য করতে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। সেজন্য মনে মনে খুশি হলেও বৌয়ের সামনে কখনও কুসুমের প্রশংসা করেন না, আবার বৌয়ের কুটকাচালিও ঝেড়ে ফেলে দেন না। বুঝিয়ে বলেন, 'কী করবে বল? গ্রামের গরীবের ঘরের মেয়ে, দোষ-ত্রুটি তো থাকবেই। একটু মেনে নাও। উপায় তো নেই না মেনে। তুমি শিক্ষিত মানুষ তোমাকেই বুঝেশুনে মানিয়ে নিতে হবে বহু মা!' — মনে মনে ভাবেন, কুসুম তোমার থেকে হাজার গুণে ভালো। কিন্তু তুমি আমার পুত্রবধূ, তাই তোমার সব অধিকার আমাকে রক্ষা করতে হবে, সামাল দিতে হবে। তুমি কুসুমের জীবন দুর্বিসহ করে তুললেও ওকে সেটা মেনে নিতে হবে। এটাই ওর দুর্ভাগ্য। আর দশটা দিন পর জানা যাবে কুসুমের গোপন ব্যাপারটা সত্য না মিথ্যা। আমি তো এখনও কোনো লক্ষণ দেখলাম না। ওটা মিটে গেলে আমি এর প্রতি এত নিস্পৃহ হয়ে থাকব না আর। ওকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে মাস্টারজীর সঙ্গে আমিও সাহায্য করব অবশ্যই। তোমাকে বুঝিয়ে দেব অল্‌কা ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া মানুষেরও আত্মসম্মান থাকে। কারও আত্মসম্মানে আঘাত করার অপরাধ করে তুমি আমার নজরে কতটা নীচু হয়ে গেছ।

কুসুম সব দেখে সব বোঝে। এখন ও নিজের অবস্থা যে কতখানি দুর্বল, কতটা পরনির্ভরশীল হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে। এখানে বাবাজী, মাজী, বড়ে ভাইয়া ওকে সুনজরে দেখেন। খাওয়া-থাকার তো অসুবিধা নেই একেবারে। কিন্তু ভাভীজী ওকে সহ্য করতে পারে না কেন সেটা বুঝতে পারে না ও। ভাভীকে খুশি রাখার চেষ্টায় সদাসতর্ক থেকেও কোথায় যে ভুল হয়ে যায় ধরতে পারে না। ভাভী রেগে যায়, বকাবকি করে। কোনও অন্যায় না করলেও বলে অন্যায় করেছ। কান্না পায় ওর, তখন লুকিয়ে কাঁদে। মাজীকে প্রথম দিন খুব ভয় পেয়েছিল, কিন্তু এই ক'দিনে বুঝেছে তিনি খারাপ মানুষ নন। ওনার মনে স্নেহ মমতা আছে। উনি ওকে সাদিসুদা বেশে রেখে ওর মঙ্গলই করেছেন। বাড়ির বাইরে এখনও পা রাখেনি ও। বাইরের কেউ আসেওনি এই বাড়িতে, তাই মাজীর শেখানো কাহিনি এখনও কাউকে বলতে হয়নি, ভাভী ছাড়া। ভাভী সব জেনেও বারবার জানতে চায় শ্বশুরালে ওকে কী কী অত্যাচার করেছে, স্বামীটা কেমন ছিল— এই সব প্রশ্ন করে। কুসুম নিজেই এখন ১৭ তারিখের জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছে, কারণ বাবাজী ওকে সত্যিই স্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হয়েছেন। ও পড়তে চায়, জীবনে কিছু হয়ে বাবাজীর ঋণ মেটাতে চায়। এখন বলরাজকে সাজা দেবার আবোল-তাবোল ভাবনাগুলো নিয়ে বেশি ভাবে না। জীবন টিকে থাকলে ওসব পরে ভাবা যাবে। এখন যিনি ওর প্রাণ বাঁচিয়েছেন, যিনি নতুন জীবন দান করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁর মান রাখার জন্য ব্যস্ত ও। বাবাজীই ওর ভগবান, তাঁর নামে নেওয়া কসম ও কখনও ভাঙবে না। ভাভী ওকে যত কষ্টই দিক ও কাউকে বলবে না, মুখ বুজে সহ্য করবে। কারণ ও বুঝে ফেলেছে ভাভী

ওকে নির্যাতন করে তাড়ানোর চেষ্টা করছে। করুক। ও নির্বিকার হয়ে মাজী, বাবাজীর সেবাযত্ন করে ওদের পায়ের তলায় নিজের স্থান কামড়ে পড়ে থাকবে।

দিন আসে দিন যায়। দেখতে দেখতে ১৫ তারিখ এসে গেল। মাজী সেদিন ভাইয়া-ভাভীর সামনে ঘোষণা করলেন — 'কাল তোমাদের বাবুজী কুসুমকে নিয়ে লখনৌ যাবেন। ওর কী একটা এফিডেবিট করাতে হবে।'

অল্‌কা ওমনি বলে ওঠে— 'বাবা রে বাবা! ওর আবার এফিডেবিট কিসের জন্য দরকার পড়ল? তিনকুলে কেউ নেই এখানে খাওয়া-পরায় কাজ করছে, ভালোই তো আছে। বাবুজী পারেনও বটে।'

প্রকাশ খিঁচিয়ে ওঠে— 'কী যা-তা বলছ তুমি? কুসুম আমাদের খাওয়া-পরার কাজের লোক? একটা ভদ্র ঘরের লেখাপড়া করা মেয়ের সম্বন্ধে এভাবে কথা বলতে হয়? ছিঃ ছিঃ। এই নিয়ে তুমি বিএ পাশের অহংকার দেখাও? ভুলে যেও না ও বাবুজীর বন্ধুর মেয়ে। অবস্থা বিপাকে এখানে এসেছে। আমাদের বোন নেই, আমি ওকে আমার বোন বলে মনে করি। আর বিকাশও তাই মনে করবে। ভবিষ্যতে ওর সম্বন্ধে কথা বলার আগে মনে রেখো তুমি আমাদের বোনকে বলছ।'

স্বামীর রাগ দেখে অল্‌কা থমকে গেল। কিন্তু সকলের সামনে অপদস্থ হয়ে ওর যত রাগ কুসুমের ওপরে গিয়ে পড়ল। শাশুড়িও ছেলেকে কিচ্ছু বললেন না। শাশুড়ির ব্যক্তিত্বকে অল্‌কা ভয় পায়, তাই তখনকার মতো চুপ করে রইল।

আবার সেই চৌরহা চৌক। এই জায়গাটার সঙ্গে ওর যেন গাঁটছড়া বেঁধে আছে— ভাবে কুসুম। সেই বেদিতে বসে কালকে ওর কী হবে সে কথাও ভাবনায় মিশে থাকে। ওর জীবন -মরণ কালকের টেস্টগুলোর উপর নির্ভর করছে। মনে টেনশন আছে, কিন্তু এত গাড়ি যাচ্ছে হাইওয়ে দিয়ে দেখতে ভালো লাগছে। আগের দুবার রাতের বেলা ছিল আজ দিনের আলোয় চারদিক, মানুষজন দেখছে ওর সতেরো বছরের চোখ।

কুসুমকে দেখে গৌরী আর হেসে কূল পায় না। মাথায় সিঁদুর, বিন্দি, দুহাত ভরা লাল-সবুজ রংয়ের কাঁচের চুড়ির গোছা। লজ্জায় কুসুমও মাথা তুলতে পারে না। গৌরী হাসি বন্ধ করে জিজ্ঞেস করে, 'চাচিজীর বুদ্ধি, তাই না?'

— 'আর কার হবে? এগুলো সেই রাত্রেই ওকে পরিয়ে, তারপর লম্বা ভাষণ দিয়ে খেতে দিয়েছে আমাদের। এগুলোর নাম ইজ্জতের রক্ষা কবচ।'

— 'কুসুমের বেশ দেখে হাসলাম বটে, কিন্তু ভাবছি, চাচিজীর দূরদৃষ্টির কথা। আগে থেকে সব ভেবে রাখেন। কুসুম তুমি শ্যাম্পু করে সিঁদুর ধুয়ে এসো। চুড়িও খুলে রাখো। যাবার দিন আবার বেশ বদল করে যেও। গলু এসব দেখেই প্রশ্ন করবে। যাও।'

কুসুম চলে যেতেই গৌরী বলল— 'পুরো ছয় সপ্তাহ হয়ে গেছে গুরুজী। ৪৫ দিন। আপনার টেনশন দূর করার জন্য আমি এখুনি হাতে ইন্টারন্যাল টেস্ট করে বলে দিচ্ছি ও প্রেগন্যান্ট হয়েছে কি হয়নি। এখন হাতেই ঠেকবে।'

— 'না, থাক। এখুনি দরকার কী? কাল হসপিটালেই করো। আমি খুব কিছু চিন্তা করছি না। ও তো এবর্ট করতে রাজি হয়েছে। থাকলে কাল একেবারেই ওটাও হয়ে যাবে।'

— 'ঠিক আছে।'

রাত থেকেই কুসুম ঘাবড়ে ছিল, ভালো করে ঘুমোতে পারেনি। আন্টি কি ওর পেট কাটবে? ভয়ে ওর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করতেও ভয় পায়, যদি রেগে যায়। আন্টির গাড়িতে ওরা হসপিটালে যাচ্ছে। নিজে গাড়ি চালাচ্ছে আন্টি। জীবনে এই প্রথম ও এমন সুন্দর একটা গাড়িতে চড়লো, কিন্তু এই আনন্দ উপভোগ করতে পারছে না কুসুম। বাবাজী সঙ্গে আছেন তবুও সাহস আসছে না মনে। সুঁই লাগাতে ওর খুব ভয় করে আর পেট কাটবে... ওরে বাবা!

যা যা ভেবে ভয়ে অধমরা হয়েছিল, সেসব কিছুই করেনি। শুধু ভয়ানক লজ্জায় চোখ বন্ধ করে রেখেছিল যখন আন্টি হাতে দস্তানা পরে ওর শরীরে হাতে করে কী করছিল তখন। একটু পরেই হাত বের করে দস্তানা খুলে ফেলে দিয়ে ওকে বলল— 'ওঠো।' আন্টির মুখটা দেখে খুশি খুশি লাগছিল। বলল— 'কুসুম আও মেরে সাথ।'

গৌরীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল কুসুমের ইউট্রাসে ফিটাস নেই টের পেয়ে। তবু একবার আলট্রা সোনোগ্রাফি করে দেখে নেওয়া উচিত, অন্য কোনও ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা জরায়ু। ওদিকে ইউরিনও ল্যাবে চলে গেছে টেস্ট করতে। ও কোনও কিছু বাদ রাখতে চায় না পুরো কনফার্ম হবার জন্য।

আল্ট্রাসোন করে যা দেখল তার জন্য প্রস্তুত ছিল না মন। কুসুম হাজারবার ধর্ষিতা হলেও কখনও মাতৃত্ব আসবে না ওর। কারণ ওর ফেলোপিয়ান টিউবের মুখ বন্ধ। সার্জারি করে খুলে না দিলে ও মা হতে পারবে না।

— 'কুসুম তুমহারা পেট মে বচ্চা নহী হ্যায় বেটা। অন্দর জখম ভী নহী হ্যায়। তুম বিলকুল ঠিক হোক। কনগ্রাচুলেশনস্।'

প্লাগ-টাগ ফ্রি করতেই কুসুম গৌরীকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে খুশিতে। গৌরী বলে— 'অব যা কর আপনা কপড়া পহেন লো। ম্যায় জা রহি হুঁ মেরী চেম্বার মে। বহা আ জানা। জাও সিস্টার কে সাথ। বো বাহার খড়ি হ্যায়।'

গুরুজীকে ওর চেম্বারে বসিয়ে রেখে এসেছে। চেম্বারে হাসি মুখে ঢুকল গৌরী। বলল— 'সমাচার শুভ হ্যায় গুরুজী।

কুসুম প্রেগন্যান্ট নহী হ্যায়। তবে ওর মা হবার প্রবলেম আছে।'— এর পর ফেলোপিয়ান টিউবের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল।

মাস্টারজী সব শুনে বললেন,— 'ওর ওসব জানার দরকার নেই। যদি কখনও সাদী হয় তখন দেখা যাবে। যাক, মেয়েটা এবার নিঃসঙ্কোচে বাঁচতে পারবে।'

রাত্রে চামেলীকে ফোন করে বললেন— 'কুয়াঁরী লড়কী কো তো সুহাগন কা ভেস পহেনা দিয়ে থে, অব ক্যাসে লড়কিকা সাদী তোড়ো গি, ওয়াপস লড়কি বনাওগী?'

কুসুম মা হতে যাচ্ছে না শুনে প্রথমেই চামেলীর বুকের পাথর নেমে গিয়েছিল। এখন স্বামীর বিদ্রূপ খুশি হয়েই গ্রহণ করলেন। বললেন, 'অব নয়া কাহানি লিখনা পড়েগা। ঝুটি বাত্ তো আপ ভী কহতে হো জী, জব গাঁও কা শুভ-মঙ্গল কাম সে কোই রুকাবট আন পড়তা হ্যায় তব শৌ ঝুট বলতে হ্যায় কাম নিপটনে কে লিয়ে। মুঝে ভী কুসুমকো আজাদ করনে কে লিয়ে ঝুট কা সাহারা লেনা পড়েগা জী।'

— 'বোলিয়ে বোলিয়ে। অচ্ছে কাম কে লিয়ে ঝুট বোলনা অধর্ম নহী মানা জাতা হ্যায়, বল্‌কি জায়েস মানা জাতা হ্যায়। কাল আর রহা হুঁ।'

ওরা ফিরে আসার পরই চামেলী কোনও গল্প কাউকে শোনালেন না। স্বামীর পরামর্শে সময় নিলেন কিছুদিন। কুসুমকে পছন্দ করতে শুরু করেছিলেন ওর ব্যবহারের জন্য। এখন স্নেহ, ভালোলাগা আসতে লাগল মনে। ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কুসুমের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিরালায় গোপন পরিকল্পনা চলে। দুজনে মিলেই গল্প তৈরি করলেন এবার। কুসুমের বদমাশ বর ওকে ডিভোর্স করার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিল, সেই কারণেই মাস্টারজী কুসুমকে নিয়ে লখনৌ গিয়েছিলেন কোর্টের শুনানির ডেট ছিল বলে। মিউচুয়াল ডিভোর্সের কাগজে মাস্টারজী কুসুমকে দিয়ে সই করিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। ডিভোর্স হয়ে গেছে ওর।

এতসব মিথ্যা বলতে ওদের দুজনের মনে কোনও গ্লানি নেই। কারণ ওনারা চান মেয়েটা সমাজে মাথা উঁচু করে যেন বাঁচতে পারে। সেজন্যই অ্যাবর্শনের জন্য গৌরী চাপ দিয়েছে, ওনারাও চাপাচাপি করেছিলেন। আজ গৌরীরা খুশি, কুসুম খুশি, ওনারা খুশি। এবার বাকি রইল কুসুমের নতুন ইতিহাস রচনার জন্য আবার পড়াশুনা শুরু করা। এই দুনিয়ায় চারজন হিতৈষী মানুষ ছাড়া কুসুমের অতীতের কথা আর কেউ জানবে না। নিজের ছেলেরাও না। সেই দরজা ওরা বন্ধ করে দিয়েছেন চিরতরে। ওনাদের মহান প্রয়াসে কুসুমের সহযোগিতাও আছে। ওকে যখন যা বলতে শিখিয়েছেন চামেলী ও বিনা দরকারে তো কিছুতে মুখ খোলেনি, কিন্তু জিজ্ঞেস করলে শেখানো কথাটুকু বলেছে, নিজে কোনও সংযোজন করেনি।

কুসুমকে নিয়ে তৈরি করা এবারকার গল্পটা মাস্টারজী নিজেই বললেন। প্রকাশ বলল— 'ভালো হয়েছে বাবুজী, বহিনা আজাদ তো হয়ে গেল! এমন বিয়ে টিকিয়ে রাখাই উচিত নয়, যেখানে সম্পর্কের মূল্য নেই। আর কুসুম বহিনা তুই চুড়ি, বিন্দি, সিন্দুর সব ছেড়ে দে। যে পতি তালাক দিয়েছে তার কল্যাণের জন্য এগুলো আর রাখবি না। সে আর তোর পতি নয়।'

কুসুম কী করবে বুঝতে না পেরে চামেলীর দিকে তাকায়। উনি বললেন— 'ভাইয়া ঠিকই বলেছে বেটা। চুড়িগুলো খুলে আমার চুড়ির বাক্সে রেখে দাও, আর মাথা ঘষে নিও। সামনের সোমবার থেকে স্কুলে যেতে হবে।'

চামেলী লক্ষ্য করছেন অল্‌কা কুসুমকে পড়তে দিতে চায় না। আগে নিজে সামান্য যেটুকু ঘরের কাজ করতো সেগুলোও কুসুমের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজের কামরায় বসে টিভি দেখে। সন্ধ্যের সময় কুসুম পড়তে বসলেই বারবার নানা ছুতোয় ওকে ডেকে নিয়ে যায়। দু-মাস মেয়েটার এক পাতাও পড়া হয়নি, এখন পুরনো পড়াও পড়তে হচ্ছে মেকআপ করার জন্য। আর নতুন পড়া তো আছেই। অল্‌কা যে এত হিংসুটে সেটা আগে জানলে প্রকাশের বৌ করে আনতেন না। তার দুই ছেলেই উদার মনের, বাবুজীর আদর্শ যতটা সম্ভব মেনে চলতে চেষ্টা করে। দাঁড়াও তোমার বাড়াবাড়ি এবার বন্ধ করতে হবে। ভেবেছিলাম, নতুন বৌ, এখনই সংসারের কাজে ঢোকাবো না। সারা জীবন তো করতেই হবে। কিন্তু তুমি মানুষের ভালোবাসার মূল্য দিতে জানো না। এবার কুসুমের কাজগুলো তোমাকে দেব। কারণ তুমি সেইসময় ফাঁকা থাকো। প্রকাশও সন্ধ্যেবেলা সেবা দল ক্লাবে চলে যায়। কুসুম আর তুমি যখন একসাথে থাকবে তখন বলব রুটিন পরিবর্তনের কথা।

পরদিন সন্ধ্যায় অল্‌কা যেই কুসুমকে ডেকেছে— 'আয়ী ভাভী' বলে মেয়েটা পড়িমরি করে ছুটে গেছে পড়া ফেলে। আর চামেলীও পেছন পেছন বৌয়ের কামরায় গিয়ে হাজির। — 'আরে বহু, এক কাম করনা বেটি... একি কুসুম তুই এখানে ভাভীর সঙ্গে গল্প করতে বসেছিস? তোর পড়া নেই? যাও, এখুনি বইপত্র নিয়ে আমার ঘরে গিয়ে পড়তে বসো। ফাঁকিবাজি আমি একদম পছন্দ করি না। এখন থেকে রোজ আমার ঘরে বসে পড়বে, বুঝলে? যত্তসব আড্ডা মারার ধান্ধা!— ও হ্যাঁ, বহু তোমাকে বলতে এসেছিলাম রাত্রের রোটি-সবজি বানিয়ে ফেলতে। কুসুমের শরীর খারাপ হয়েছে, ও রসুই ঘরে যাবে না। আমার বয়স বাড়ছে, কোমর-পিঠে ব্যথা হচ্ছে। বেশ কিছুদিন কুসুম করেছে, বিশ্রাম পেয়ে ব্যথাটা কমে গিয়েছিল। এখন

ওকে পড়ার সময়ও দিতে হবে বলে আবার নিজে করতে গেলাম। ব্যাস্, ব্যথা বেড়ে গেল। আজ থেকে সকালের নাস্তা আর রাতের খাবারের ভার তোমার উপর। উঠে পড়। আটটার আগে হয়ে যাওয়া চাই। প্রকাশ না হলে রাগ করে না খেয়েই শুয়ে পড়বে। যাও যাও, দেরি করো না।'

— 'জী মা-জী। জা রহী হুঁ।'— ব্যাজার গলায় বলে বহু।

হরিয়ালে এখন আগের মতো মাঠের মধ্যে হপ্তা বাজারের দিন নেই। সপ্তাহে একদিন হাট বসে এখনও, কিন্তু ভালো ভালো দোকানে ছেয়ে গেছে হরিয়াল। জামা-কাপড়, জুতো, মুদিখানা থেকে শুঁড়িখানা সবই এখন হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। শহরে যেতে হয় না। এখন হরিয়ালে শহুরে হাওয়া বয় সুন্দর সুন্দর সাজানো দোকানগুলোয়। চামেলী যেদিন বৌকে রান্নাঘরে ঢোকালেন তার পরদিন নিজে বিকেলে বাজারে গিয়ে বৌয়ের জন্য ঝকমকে পাথর সেটা করা একসেট চুড়ি আর কুসুমের জন্য সুতির সালোয়ার স্যুট কিনে এনে উপহার দিলেন। সুন্দর বেলোয়ারী চুড়ি পেয়ে বৌ গদগদ হলো। আর কুসুম বলল— 'আমার জন্য টাকা খর্চা করে এখন কেন আনলেন মাজী? এখন আমার চারখানা সালোয়ার স্যুট আছে।'

— 'আছে, কিন্তু পুরনো, রং চটে গেছে। সামনের মাসে আর একটা কিনে দেব। তাছাড়া তোর পেটে বাচ্চা আসেনি জেনে যে কী শান্তি হলো, সেই খুশিতে কিনলাম।'

স্কুলে ক্লাসের মেয়েদের মধ্যে একদল প্রথম দিন থেকেই ওর সঙ্গে মিশতে শুরু করেছে, আর এক দল দূর থেকে লক্ষ্য করছে, এখনও কথা বলেনি। গ্রামের সবাই ওর কথা জানে, হয়তো সে জন্যই ওরা একটা বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে ইচ্ছুক নয়। মাজী বলে দিয়েছিলেন, এইরকম হতে পারে, তুই দুঃখ পাস না। কুসুম এখন কোনও কিছুতেই দুঃখ পায় না, কিংবা এইটুকু বয়সে বড় বড় দুঃখ পেয়ে ওর দুঃখ হজম শক্তি বেড়ে গেছে। মাজী বলেছেন, আস্তে আস্তে সময়ই সব ঠিক করে দেয়, ওরও ভালো সময় আসবে। ও জানে, মাজী এখন ওকে স্নেহ করেন, ওকে জীবনের প্রতি আসক্তি, উদ্যম বাড়াতে সাহায্য করেন। আশা দেন। কিন্তু কেউ বোঝে না যে ওরও মন ছিল, সেই মনে কল্পনা ছিল, অনেক কিছু করে দেখাবার উদ্দীপনা ছিল। ও একটা কিশোরী মেয়ে মাত্র ছিল দু'মাস আগেও। একদিন এক অঘটনে ও বয়স্ক নারী হয়ে গেল আপন-পর সকলের নজরে। জীবনের শুরুতেই ওর মন, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সাধ-আহ্লাদ সব কিছু মরে গেছে। ভালো সময় আসার অপেক্ষা করতে ও ভুলে গেছে। এখন গড্ডলিকার মতো গড়িয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। ক্লাশে সবাই বন্ধু হলো না বলে ওর কোনও দুঃখ নেই। আজ যারা বন্ধু তারা কাল ওর কলঙ্ক জানতে পারলে আর বন্ধু থাকবে না। কিন্তু যে চারজন ওর কলঙ্ক গোপন রাখার চেষ্টায় কখনও ওর প্রতি কোমল, কখনও কঠোর হয়েছেন সেই বাবাজী, মাজী, ডক্টর আঙ্কেল, আন্টি— এদের ও হারাতে চায় না। এক জীবনে ওদের ঋণ শোধ করবে কী করে? তাই বারবার জন্ম নিতে হবে ওকে।

আর্টসের ছাত্রী নতুন মেয়ে কুসুম সিং যে কিনা সেশনের মাঝখানে এসে ইলেভেন ক্লাশে অ্যাডমিশন নিয়েছিল, সে এই মাসের ক্লাশ টেস্ট পরীক্ষায় অকল্পনীয় মার্কস পেয়ে ফার্স্ট হয়েছে। এতো হাই মার্কস সচরাচর এই স্কুলের ছেলে-মেয়েরা পায়নি কখনও। তাও প্রত্যেকটা সাবজেক্টে ৯৭-৯৮, ভাবাই যায় না আগে। টিচার্স কমনরুমে কুসুম সিং আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে টিচারদের কাছে। এক বাক্যে ওরা বলছেন— ওর পেপারে একমাত্র নম্বর লেখা ছাড়া আর একটা ডট্ পর্যন্ত দেননি, মানে সামান্য স্ক্র্যাচও পড়েনি কারও কলম থেকে। যেমন হ্যান্ড রাইটিং তেমনি টু দ্য পয়েন্ট আনসার। বিস্ময় বালিকার পেপার নিয়ে টানাটানি হয়ে যায় টিচারদের মধ্যে। ওরা প্রকাশকেই বাধাই দিতে থাকে— 'জরুর তুমনে কোচ কিয়া হোগা।'

— 'না, ও নিজে নিজেই পড়েছে, কারও সাহায্য ছাড়াই। পল সাইন্স, হিস্ট্রি— এগুলোর আমি কী জানি? আমি কী করে পড়াবো বলো?'

বাড়িতেও হৈচৈ হলো খুব। চামেলী মহা খুশি। সারা গ্রামে সেই বার্তা রটে গেল ক্রমে। চারিদিকে শুধু কুসুম সিংয়ের কথা। পাস কোর্সে কোনওমতে বিএ পাশ অল্‌কা খুশি হতে পারল না।

— এই মেয়েটা রূপে গুণে কাজেকর্মে সব দিক থেকে আমাকে নীচু করে দিচ্ছে, কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে। এখন আমার চেয়ে বাইরের মেয়ের কদর বেশি। শাশুড়ি খারাপ নন, কিন্তু ওই মেয়ের পড়া পড়া করে বেশি মাথায় তুলে ফেলছেন। ওর এতো পড়াশুনা করার দরকার কী বুঝি না আমি। ডিভোর্সি মেয়েকে তো কেউ সেধে বিয়ে করতে আসবে না! আশ্রয় দিয়েছ ঠিক আছে, আশ্রিতার মতো থাকুক। কিন্তু তোমরা তো মেয়ে বানিয়ে ফেলছ! আমার প্রকাশবাবু তো বোন বলতে অজ্ঞান! ওকে নাকি সম্মান দিতে হবে। এতো প্রশ্রয়ে ওর অধিকার বাড়বে বই কমবে না। একটা সময় আসবে যখন ও জমিজমা, সম্পত্তির অংশ চেয়ে ফেলবে। তখন কী করবে? কী যে করি? আমি, আমার যারা সন্তান হবে আমরা সবকিছু থেকে বঞ্চিত না হয়ে যাই, সেটাই ভয় হয়। নাহ! একে তাড়াবার জন্য কাজে লেগে পড়তে হবে। এদিকে এমন রেজাল্ট করল যে গ্রামশুদ্ধ লোক ধন্য ধন্য করছে। আমার বিএ পাশের এই গ্রামে কোনও মূল্য নেই। এরকম বিএ পাশ নাকি এখানে ঘরে ঘরে আছে। ধুর, কিচ্ছু ভাল্লাগে না।

কুসুম ওর একটা বই খুঁজে পাচ্ছে না। স্কুলে ফেলে আসার মেয়ে ও নয়, জানে বাড়ির লোক। অনেক খুঁজেও বইটা পাওয়া গেল না। সামনের মাসের টেস্ট পরীক্ষার প্রিপারেশন করবে কী করে? ও নিজে কিছুই বলে না, কিন্তু চামেলীর মনের সন্দেহ যায় না, তাই তিনি আনাচে কানাচে নিঃশব্দে খুঁজে চলেছেন কয়েকদিন ধরে। কোথাও নেই। প্রকাশ অবশ্য স্কুল থেকে ওই বইয়ের একটা কমপ্লিমেন্টারি কপি এনে দিয়েছে কুসুমকে, কিন্তু ওর আগের বইটা তো হাওয়ায় উড়ে যায়নি। গত ৫-৬দিন ধরে খুঁজেও কেন পেল না ভাবছিলেন রসুই ঘরে বসে। এমন সময় সাফাইওয়ালা হরিয়া রসুড় সাফ করতে এলো।

— 'হরিয়া কুসুম দিদির একটা মোটা কিতাব পাওয়া যাচ্ছে না। তুই সাফাই করার সময় চারদিকে ধ্যান রাখবি বুঝলি?'

ঝাড়ু দিতে দিতে হরিয়া বলে— 'এক মোটা কিতাব তো আমি গাইশালায় তুলে রেখেছি। গাইয়ের জাবে ফেলা ছিল। কিতাব দেখে আমি তুলে রেখেছি। এখুনি এনে দেখাচ্ছি, দাঁড়ান।' ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছিল।

চামেলী মাস্টারজীকে ছাড়ার আর কাউকেই বই পাওয়ার কথা জানালেন না, এমনকী কুসুমকেও না। মাস্টারজী বললেন— 'সতর্ক থাকা ছাড়া আর কী করবে? আরও অনেক কিছুর জন্য তৈরি থাকো।'

এই ঘটনার মাসখানেক পরে ছোট ছেলে বিকাশ ছুটিতে বাড়ি এসেছে। বিকাশ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে। বাড়িতে আনন্দের বাতাবরণ। পুরো পরিবার এক সঙ্গে নিজেদের বাড়িতে, এর চেয়ে বেশি আনন্দ আর কী হতে পারে? বিকাশ কুসুমকে প্রথম দেখল। ওর মনে হলো এই আপাত শান্ত, সুশীল, সুন্দরী মেয়েটির মধ্যে ভরা পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না যেমন আছে, তেমনি অন্তর্নিহিত রূপে সূর্যের প্রখর দাবানলও ধিকিধিকি জ্বলছে। বাবুজী আর মা এই মেয়ের ভার নিয়েছেন বলে বেশ গর্ব হচ্ছে ওর। ওদের সংসারে কোনও অভাব নেই। একটা মেয়েকে প্রতিপালন করে জীবনে প্রতিষ্ঠা করিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য আছে, বাবা-মার আদর্শবাদ আছে, তাহলে কেন করবেন না? দরকার পড়লে ভাইয়া আর ও দুজনে মিলে সাহায্য করবে এমন মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে।

এবছরই ওর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শেষ বছর। আগামী বছর থেকে চাকরি করবে। যদিও ছেলেদের টাকার আশায় বাবুজী বসে নেই, ক্ষেতের ফসল, বাবুজীর পেনশন ওনার আয়ের উৎস। তাঁর উপার্জন কম নয়। তবুও ওরা দুই ভাই কেন কর্তব্য পালন করবে না? ভাভী অল্‌কাকে বিকাশের ভালো লাগে না। অসম্ভব আত্মসর্বস্ব, অহংকারী মানুষ অল্‌কা ভাভী। সেই জন্য দেওর-ভাভীর মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটা এক্ষেত্রে হয়নি। ওপর ওপর শ্যালো রিলেশনশিপ আছে ডেপথ্ নেই। তাই ছুটিতে বাড়ি এলে অবসর কাটানোর জন্য বিকাশ 'গ্রাম সেবাদল'এর সঙ্গে কাজ করে, নিজের বাড়ির চারপাশে গজানো লতা, ঝোপঝাড় কেটে সময় কাটায়। এমনকী প্রত্যেকটা কামরায় জিনিসপত্র সরিয়ে কোণাগুলোতে জমে থাকা ধুলো নিজের হাতে সাফ করে। ছারপোকা না লাগার জন্য সব বিছানা তুলে ছাদে রোদ খাইয়ে আবার এনে পেতে দেয়।

সেদিন কুসুমের ছোট কামরায় সাফাই করবে ঠিক করেছে। ঘরটাকে যদিও কুসুম নিজেই গুছিয়ে রাখে দেখেছে ও। কিন্তু সব সরিয়ে ও আর কী করে সাফ করবে? যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, ততক্ষণ মাকে সব কাজেই সাহায্য করে লক্ষ্য করেছে। আর কত করবে? তাছাড়া ও যখন ভাইয়ার কামরা সাফাই করে, তখন কুসুমের ছোট ঘরখানাই বা করবে না কেন? মেয়েটা তো এই পরিবারেরই একজন। ওয় বয়সী ছোট বোন যদি থাকত তাহলে কি করে দিত না? ভাভী ওকে পছন্দ করে না বুঝতে পেরেছে বিকাশ। এরই মধ্যে বিকাশের কাছে ওর সম্বন্ধে বেশ নিন্দে করে ফেলেছে ভাভী।

দুপুর এগারোটায় মা আর ভাভী ছাড়া এই বাড়িতে আর কেউ থাকে না। এখন অবশ্য ও থাকে। সেদিন ও কুসুমের ছোট ঘর সাফাইয়ের জন্য ঝাড়ু নিয়েছে যখন, তখন হঠাৎ দেখে ভাভী চারপাশে তাকিয়ে পা টিপে টিপে ছোটঘরের দিকে যাচ্ছে। একটু পরে একই ভাবে চোরের মতো বেরিয়ে এসে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। মা তখন রসুই ঘরে। ব্যাপারটা দেখে বিকাশের বেশ সন্দেহ হচ্ছে। ভাভী বলেছিল— 'আমি ওর ঘরে যাই না, ওর সঙ্গে মিশিও না। আমার বাইরের ঐ মেয়েটাকে বিশ্বাস নেই।'— তাহলে এভাবে লুকিয়ে চোরের মতো গেল কেন? উদ্দেশ্য কী? বিকাশ মোবাইলে ওর যাওয়া-আসার ছবি তুলে নিল।

এই কামরায় ও নিজেও থেকেছে। তখন যেমন ছিল তেমনি আছে। তক্তাপোশে তোষক, বালিশ, পড়ার টেবিল চেয়ার আর উঁচু টুলের ওপর টেবিল ফ্যান— এইটুকু আসবাব। পরিষ্কারই আছে একটু চাট্ আপ করলেই হয়ে যাবে। আগে বিছানাটা ছাদে রোদে দিয়ে আসবে ভেবে যেই তোষকটা টেনে নামিয়েছে ওমনি ঠক্ করে মেঝেতে কিছু পড়ল। একটা গলার হার। এই সোনার হার ওর চেনা, এটা মা-র গলায় থাকত। মা ভাভীকে আশীর্বাদ করেছিল এই হার দিয়ে। এখন ভাভীর গলায় থাকে, আজ সকালেও ভাভীর গলায় ঝকঝক করে ঝুলতে দেখেছে। আচ্ছা! এবার অল ক্লিয়ার হলো। হারটা তুলে হাফ প্যান্টের পকেটে রেখে নিজের কাজ সম্পূর্ণ করে বিকাশ। কাউকে একটা আভাসও দেয় না। ভাভী তার মানে কুসুমকে

চোর সাব্যস্ত করতে চেয়েছে! বেশ। এবার তোমার পোল খুলব আমি। এসব নিশ্চয়ই অনেকদিন ধরেই চলছে। এখানে থাকি না তাই জানি না আমি। মা কাউকে বলেও না। ছিঃ ছিঃ! বেচারা ভাইয়ার কত খারাপ লাগবে বৌয়ের নীচতা জানলে! কিন্তু জানা দরকার। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলে বাড়ে। কাজ শেষ হলে ঘরে এসে ভাভীর হারটাকে নিজের সুটকেসে রেখে লক করে দিল। বাবুজী দুপুরে আসবেন না বলে খেয়েদেয়ে বেরিয়েছেন। দুপুরে ওদের খাওয়ার পর বিকাশ এসে মা-র পাশে শুয়ে পড়ল। এ কথা সে কথার পর বলল— 'মা, তুমি কি জানো ভাভী কুসুমের এখানে থাকা পছন্দ করে না?'

— 'জানি। কেন, তোকে কিছু বলেছে নাকি?'

— হ্যাঁ, বলেছে। কুসুমের অনেক নিন্দা করেছে। বলেছে, এত এত নম্বর ও পেতেই পারে না। বাবুজী ওকে পালন করছেন বলে টিচাররা পক্ষপাত করে বেশি নম্বর দিয়েছে। আরও অনেক কিছু বলেছে।'

— অল্‌কা কুসুমকে খুব হিংসে করে আমি জানি। আসলে, রূপে, গুণে ব্যবহারে কুসুম যে ওর থেকে অনেক শ্রেয় এটা অল্‌কা মানতে পারে না। এরকম হয়, তুই এসবের মধ্যে মাথা গলাস না। আমি তো আছি!'

— 'কেন? মাথা গলাব না কেন? তুমি একা আছো, কেন আমরা আছি তো! বাবুজী যাকে এনেছেন, মেয়ে বলে গ্রহণ করেছেন, তার কোনও ব্যাপারে একটা কথা বলারও হক নেই ভাভীর? দেখ মা, তুমি তাপ্পি মেরে আমাদের কাছে ভাভীর অন্যায় গোপন করে কতদিন অশান্তি এড়াবে? ভাভী অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় কুসুমকে কেন্দ্র করে, কুসুমকে অপদস্থ করে তোমাকে অশান্ত করতে চায়, যাতে তুমি কুসুমের বিরোধী হয়ে দাঁড়াও। বল তো আমাকে আজ অব্দি ভাভী কী কী করেছে? মিথ্যে বলবে না। আমি নিজে এমন প্রমাণ পেয়েছি যে তুমি ভাবতেও পারবে না, আর ভাভীকে ঢাকতেও পারবে না। বল, আমারও জানার অধিকার আছে।'

— 'তোর কাছে আবার কী প্রমাণ এলো?'

— 'পরে বলব। কথা ঘুরিও না, মা। বল।'

অগত্যা বাধ্য হয়ে চামেলীকে বলতে হয় কুসুমকে বাড়ির খাওয়া-দাওয়া পরার কাজের মেয়ে বলে প্রকাশের কাছে কড়া বকুনি খাওয়ার কথা, পড়তে বসলেই ডেকে নিয়ে পা টেপানো, মাথায় তেল মাখানোর কথা, ইকনমিক্সের বই গোরুর জাবে ফেলে দেবার কথা— সবই বলেন।

— 'আমি কত যে ব্যালেন্স করে চলি জানিস না। কুসুম কোনও প্রতিবাদ করে না রে। নিঃশব্দে

থাকে। ওর সব কাজ করে দেয় তবুও ওর রক্ষা নেই।'

— 'আর তুমি বাবুজী, ভাইয়া সকলের কাছে এই দুরাচার লুকিয়ে রেখে শান্তি পেতে চেয়েছ? ভুল করেছ মা। এভাবে শান্তি আসে না, শত্রুকে ফেস করে বুঝিয়ে দিতে হয় সে তার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছে।'— এরপর ও সুটকেস খুলে হার বের করে স্বচক্ষে দেখা ঘটনা বলল মাকে।

— 'এতদূর গেছে?'

— 'তোমার জন্য গেছে মা। আর যেতে পারবে না। ভাইয়া, বাবুজীকে সব বলব আমি। ওরাই দাওয়াই দেবে। এখন ভাভী যেন জানতে না পারে। ওকেই আগে হার পাচ্ছে না এ কথা বলতে দাও। এই দেখ প্রমাণ।' — মোবাইলে তোলা ছবি খুলে মাকে দেখায়— 'এটা ঘরে যাওয়ার সময়। বুকের ওপর হার ঝুলছে দেখ। আর এটা বেরিয়ে আসার সময়। গলায় হার নেই। সরি মা, আমার ভীষণ সন্দেহ হয়েছিল। ওর এটা মাটিতে পড়ে যাওয়া হার।'

চামেলীর চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে— 'আর ক্ষমা নয় তোমাকে। কুসুমের দিকে চুরি অপবাদের আঙুল তুলে তোমাকেও ওর মতো ডিভোর্সি হয়ে বৌদিদের আশ্রয়ে দাদাদের বাড়িতে থাকতে হবে অল্‌কা বহু! প্রকাশ তোমাকে ক্ষমা করতে পারবে কিনা জানি না, কিন্তু আমি আর পারব না। আমার ঘরের চালে তুমি আগুন লাগাচ্ছ, কুসুম নয়। আমাকে ঘর বাঁচাতে হবে।'

এরপর ঘটনা অনেক দূর গড়ালো। অল্‌কা ওর হার খুঁজে পাচ্ছে না বলে ঘোষণা করল সকলের সামনে। ও নাকি ড্রেসিং টেবিলের ওপর রেখেছিল। বাথরুম থেকে স্নান করে এসে দেখে ওখানে নেই। সব জায়গায় খুঁজেছে, পায়নি।

চামেলী জিজ্ঞেস করেন— 'কখন হলো এটা?'

— 'আজ সকালে মাজী।'

— 'আজ সকালে তুমি স্নান সেরে যখন রসুইয়ে এসেছিলে তখন তো তোমার গলায় হার ছিল। আমি দেখেছি।'

প্রকাশ বলল— 'স্কুলে যাওয়ার আগে ড্রেসিং টেবিলে আমি চুল আঁচড়িয়েছি, কই ওখানে তো দেখিনি। তুমি তখনই বাথরুম থেকে এলে। হারটা আমিও তোমার গলায় দেখেছি তখন। কোথায় যাবে গলা থেকে? তুমি পরে কোথাও রেখেছ হয়তো। খুঁজে দেখ।'

বিকাশ বলল— 'তোমরা সবাই বেরিয়ে যাবার পর ভাভীর সঙ্গে আমি কতক্ষণ কথা বলেছি। তুমি লম্বা হারটা মুখে নিয়ে কথা বলছিলে ভাভী। অন্য কোথাও রাখোনি তো? মা, তুমি আর আমি ছাড়া বাড়িতে ঐসময় আর কেউ ছিল না। কিন্তু! মা রসুইয়ে ছিল, আমি উঠানে ছিলাম। তবে কে নিল?'

— 'কী করে বলব? আমার স্পষ্ট মনে আছে খুলে ড্রেসিং টেবিলে রেখেছি। তোমরা বলছ আমার গলায় হারটা দেখেছ। আমার অন্যরকম মনে হচ্ছে। কেউ ওটা চুরি করেছে।'

প্রকাশ হেসে ফেলল — 'চোর তাহলে আমি। ড্রেসিং টেবিল আমি ব্যবহার করেছি তখন। আমি ওটা ওখান থেকে নিইনি, তোমার গলা থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি।'— হা-হা-হা— প্রকাশ হাসতে লাগল।

— 'মজাক্ ছোড়ো। চোর এবাড়িতেই আছে। জানি আমি।'

বিকাশ বলে— 'ভাইয়া, বাবুজী, কুসুম এরা তো ছিল না, ছিলাম আমি। তাহলে আমিই চোর একথা বলছ কি?'

— 'না, না। ছিঃ! আমার মনে হচ্ছে কুসুমের কামরা সার্চ করলেই বেরিয়ে পড়বে।'

কুসুম করুণ কণ্ঠে বলল, 'আমি তো সবচেয়ে আগে বেরিয়েছি ভাভী। তুমি তখনও স্নানে যাওনি। আমিও তোমার গলায়ই দেখে গেছি।'

— 'ব্যাস ব্যাস!' ধমকে ওঠে প্রকাশ— 'আমি জানতাম তুমি কুসুমকে টার্গেট করবে। তোমার মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে না আমার।'— বলে প্রকাশ উঠতে যায়। বিকাশ বলে— 'ভাইয়া এখানে চুপ করে বসো, চলে যেও না। হার আমার কাছে, চোরের ওপর বাটপারি আমি করেছি। মাকে, বাবুজীকে প্রমাণ সহিত সব জানিয়েছি। বাবুজী এখুনি আসবেন, তিনিই ফয়সলা করবেন, তুমি শান্ত হয়ে বসো। কেউ কোথাও নড়বে না, সবাই এখানে থাকো।'

ঘরের ভেতর সূঁচ পড়লে শোনা যাবে এমন নিঃস্তব্ধতা। একটু পরে পরমেশ্বর এলেন। তাঁর মুখ ভীষণ গম্ভীর, মুখে চিন্তার ছাপ। বিকালে বাড়ি ফিরে চামেলী আর বিকাশের কাছে সব শুনে, মোবাইলে তোলা ছবি দেখে তিনি স্তম্ভিত। এতদিন ধরে বাড়িতে এই কাণ্ড চলছে আর চামেলী সব গোপন করে রেখেছে তাঁর কাছ থেকে সেজন্য ক্ষুব্ধ হলেন। জল মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার পর তিনি জানলেন। অল্‌কার দুই দাদা তাঁর পরিচিত শুধু নয়, ঘনিষ্ঠ এবং অনুরাগীও বটে। ওমপ্রকাশ আর বেদপ্রকাশের মতো সজ্জন দুই ভাইয়ের একমাত্র ছোট বোন অল্‌কা যে এমন অ-সজ্জন হতে পারে একথা কে জানত? বড় ভাই ওম একদিন বলেছিল— 'মাস্টারজী, পরকাশ কা সাদী কে বারে মে কুছ সোঁচা? যদি ভাবেন এখন সাদী করাবেন তাহলে আমাদের বোনকে একবার দেখতে পারেন। ও শাহাগঞ্জ কলেজ থেকে বিএ পাশ করেছে, দেখতে ভালোই। আপনারা আমাদের স্বজাতি ব্রাহ্মণ, তাই বললাম।'

ওমপ্রকাশ, বেদপ্রকাশের বোনের খারাপ তো হওয়ার কথা নয়। চামেলী আর প্রকাশকে নিয়ে শাহাগঞ্জে মেয়ে দেখতে গিয়ে পছন্দ হলো। বিয়েও হয়ে গেল। তখন বোঝেননি

বাইরের রূপ দেখেছেন, ভেতরের রূপ অজানা রয়েছে। অবশ্য বেশিরভাগ লোক বাইরেটা দেখেই পছন্দ করে, ভেতর কেমন না জেনেই বিয়েসাদি হয়ে যায়। ভাগ্য ভালো থাকলে ভেতরও সুন্দর পাওয়া যায়, নাহলে খুবই সমস্যা সৃষ্টি হয়। যেমন তাঁদের হয়েছে।

— 'ওম আউর বেদ দোনো আর রহেঁ হ্যাঁয়।'

অল্‌কা যে ভয় পেয়েছে ওর কথাতেই বোঝা যায়— 'ভাইয়ালোঁগ কিঁউ আর রহে হ্যাঁয় বাবুজী?'

— 'কিঁউ কি ম্যায়নে বুলায়া হ্যায়।'

ওমপ্রকাশ, বেদপ্রকাশ এলো। সব শুনে, ছবি দেখে এর আগেও কুসুম আসার পর থেকে মেয়েটার প্রতি অল্‌কার বিজাতীয় বিতৃষ্ণার কাহিনি শুনে লজ্জায় অধোবদন হয়ে বসে রইল। এবাড়ির বড় ছেলে প্রকাশকে ছোটভাই ছবি আগে দেখায়নি। সে তো ঐ ছবি দেখে এখন পাগলের মতো ওম ভাইয়ার হাত ধরে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলতে লাগল— 'আপনারা ওকে নিয়ে যান ভাইয়া। এই মুহূর্তে আমি ষড়যন্ত্রকারী বিকৃত মনের একজন মানুষের সঙ্গে বাস করতে পারব না।'

— 'আমি তোমার মনের অবস্থা, মাস্টারজীর পরেশানি বুঝতে পারছি সবই। মাস্টারজী কুসুমকে এনেছেন, পালন করছেন একথা শাহাগঞ্জেও অনেকে জানে। ওরা আমাদের বধাই দেয় এমন লোকের ঘরে বোনকে সাদি করিয়েছি বলে। গর্বে আমাদের বুক ফোলে। আর এখানে অল্‌কা সেই নিরীহ মেয়ে কুসুমকে অযথা নির্যাতন করে চলেছে। আজ তো আমার নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে। মাস্টারজীর সংসারে অশান্তির কারণ আমার বোন। ছিঃ ছিঃ ! আমাকে বিশ্বাস করে উনি তোমার সাদি অল্‌কার সঙ্গে করিয়েছেন। আমি যে সকলের কাছে বিশ্বাসঘাতক হয়ে গেলাম। ওকে নিয়ে যাবো প্রকাশ। অবিশ্বাসী পত্নীর সঙ্গে জীবন কাটানো যায় না। ওর আক্কেল ঠিকানায় আনা দরকার। যদি ও নিজেকে বদলাতে পারে, আর যদি তুমি ক্ষমা করতে পারো তখন দিয়ে যাবো। আজ ও আমাদের সঙ্গেই যাবে।'

ছোট দাদা বেদপ্রকাশ বলল— 'আমার ভাভী আর বৌ বলত অনেক সময় অল্‌কা ওদের হিংসে করে, কিন্তু আমরা দু'ভাই ওদের কথায় কান দিইনি, ভেবেছি, ওরাই ননদকে কাঁটা মনে করে। আজ বুঝলাম ওরা দুজন সত্যি কথা বলত। আমিও তোমার পক্ষে রায় দিচ্ছি। অল্‌কা স্বর্গ পেয়েছিল। স্বর্গ ওর ভালো লাগল না। এবার তাহলে হাড়ে হাড়ে বুঝুক কী হারিয়েছে। আমাদের মুখে কালি লেপে আমাদের ভালবাসা, সহানুভূতি তো খুইয়ে দিয়েছে, এখন ওর ভাভীরাও আগের মতো ননদকে তোয়াজ করে চলবে না আর। স্বামীর ঘর করতে না পেরে ফিরে আসা ননদকে ওরা তো আশ্রিতার নজরেই দেখবে। এটাই স্বাভাবিক। মাস্টারজীর পুত্রবধূ হওয়ার সৌভাগ্য ও নিজের দোষে হারালো। আমরা তো চোখে দেখে যাচ্ছি। অ্যাই অল্‌কা, চল। এখন আর কেঁদে লাভ নেই। আমাদের নাক-কান কেটে মুখে চুনকালি মাখাবার আগে ভাবা উচিত ছিল। মাস্টারজীর গোদ নেওয়া (পোষ্যকন্যা) মেয়েকে বাড়ির কাজের লোক বলে অপমান করেছিলি, এবার তোর কপালে কত অপমান অপেক্ষা করছে টের পাবি। চল, ওঠ।'

অল্‌কা শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামীর পায়ে পড়ে বারবার কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল— 'ম্যায়নে গলতি কিয়া, কসুর মাফ কর দিজিয়ে, বচন দে রহী হুঁ, আগে আউর কভি য়্যাসা নহী হোগা। মাজী, বাবুজী কৃপয়া মুঝে মাফ কিজিয়ে।'

কেউ উত্তর দিল না। কঠিন মুখে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। বেদপ্রকাশ হাত ধরে টেনে অল্‌কাকে আঙ্গন পেরিয়ে বাইরের বৈঠকখানায় নিয়ে গেল। — 'এক কাপড়ে যেতে হবে তোকে, ওখানে গিয়ে পুরনো কাপড় পরবি।'

ওমকে নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় পরমেশ্বর বললেন— 'আমি তোমাদের দুই ভাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ ওম, তোমরা যে আমার কথায় এখানে ওকে সাপোর্ট না করে ওকে বুঝিয়ে দিয়েছ ওর ব্যবহারে তোমাদের মাথা কাটা গেছে, তার জন্য কৃতজ্ঞ। ওর ভাঙন শুরু হয়ে গেছে, কয়েকটা মাস বাড়ির সবাই মিলে অবহেলা করলে হুঁশ তাড়াতাড়ি ফিরবে। আমি শুধু চাই ও ঠেক খেয়ে বদলাক। কিছু ঘাবড়িও না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি সমানে খবর নেব।'

— 'জানি মাস্টারজী। আপনি যেভাবে বলবেন, সেভাবেই ওকে শাসন করব। আঘাত ফেরত আঘাত হয়ে নিজের উপর এলেই বুঝবে কতটা চোট লাগে। সেটাই করা হবে। আমরা জানি, স্যার আপনি কখনও বিচ্ছেদ চাইবেন না। সময় মতন অল্‌কা এখানে আসবে এও জানি। তাই বেদ বলেছে অল্‌কাকে বিবাহ বিচ্ছেদের ভয় দেখিয়ে পথে আনবে। ওর ভাবিরাও ইচ্ছা না থাকলেও একটু খারাপ ব্যবহার করবে এবার।'— বলে ওম একটু হেসে বলল— 'চিন্তা করবেন না, ক'টা মাস সময় পেলেই ওকে আমরা জন্মের মতো বদলিয়ে সভ্য করে দেব, কথা দিলাম।'

কুসুম কেঁদে অস্থির, ওর জন্য অল্‌কা ভাভী আর বড়ে ভাইয়ার বিচ্ছেদ হলো, ভাভী চলে গেল। ও নিজেকে অশুভ বলে মনে করছে। অনেক বুঝিয়ে ওকে শান্ত করা হলো। ওদিকে প্রকাশও একেবারে চুপচাপ হয়ে গেছে। মুখে হাসি দেখা যায় না। স্কুল আর সেবাদল ক্লাব নিয়ে পড়ে থাকে। চামেলীর বুক ফাটে, মুখে কাউকে কিছু বলতে পারেন না। ওনার সুখের সংসার সত্যিই ভেঙে গেল। এক একবার মনে হয়, কুসুম কি

সচমুচ অশুভ? তার পরই মনে হয়, ছিঃ এসব কী ভাবছি আমি? বহু চলে গেছে, বিকাশ ছুটিটা বাজেভাবে কাটিয়ে বেনারস ফিরে গেছে। সারাদিন তিনি একা।

পরমেশ্বর স্ত্রীর যন্ত্রণা বোঝেন, ছেলের মনের অবস্থাও অনুভব করেন। কিন্তু ধৈর্য হারালে চলবে না। একটু কষ্ট হবে বর্তমানে, তবে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য এই সাময়িক কষ্ট সহ্য করতে হবে ওদের।

এলাহাবাদের নামকরা ক্রিমিন্যাল ল-ইয়ার রাজীব শ্রীবাস্তব তার অ্যাসিসটেন্ট জুনিয়র ল-ইয়ার কে কে সিংকে একটা কেস ব্রিফ করছিলেন। কেসটা ইউপি-র এক ইনফ্লুয়েন্সড ফ্যামিলির মেয়ের রেপ হওয়া নিয়ে। কে কে সিং এর আগে চারখানা রেপ কেস অত্যন্ত সাকসেসফুলি হ্যান্ডেল করে ভিক্টিমকে জিতিয়ে দোষীকে সাজা পাইয়ে রাজীব শ্রীবাস্তবের নাম বার অ্যাসোসিয়েশনে রৌশন করেছেন। তাই কে কে সিংয়ের হাতেই এবারের কমপ্লিকেটেড কেসটাও দিতে এতটুকু দ্বিধা করেননি অ্যাডভোকেট শ্রীবাস্তব। রেপ ভিক্টিম মেয়েটি মাইনর। বয়স ষোলো বছর। মেয়ের জ্যাঠা ইউ পি-র বর্তমান রুলিং পার্টির মন্ত্রী, বাবা ছোটোখাটো শিল্পপতি, রুলিং পার্টির সদস্য। ওকে কিডন্যাপ করে পাঁচ কোটি টাকা র‍্যানসম চাওয়া হয়েছিল। পাঁচদিন পর পুলিশ এক পরিত্যক্ত ওয়্যার হাউস থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। ওর উপর পাঁচদিন ধরে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে। পুলিশ ওদের নিজস্ব intel ধরে এগিয়ে দুজনকে অ্যারেস্ট করেছে, কিন্তু মূল পাণ্ডা পলাতক। জ্যাঠা মন্ত্রী মহোদয় রাজীব শ্রীবাস্তবের হাতে কেস দিয়েছেন। আর রাজীব তার আস্থাভাজন জুনিয়র কে কে সিংকে এ কেস লড়বার জন্য তৈরি করছেন। এই কেস একটা প্রেস্টিজ ফাইট। যেভাবেই হোক জিততেই হবে। কারণ রাজীবের প্রোফেশন্যাল কম্পিটিটার অ্যাডভোকেট যোশী অপোনেন্ট সাইডে ব্যাটিং করতে মাঠে নেমেছেন।

স্যারের ব্রিফিং শেষ হওয়ার পর জুনিয়ন লাইয়ারদের রুমে এক কাপ কফি নিয়ে বসে কে কে সিং। কফি পান করতে করতে ভাবে ওর সাকসেস, ওর প্রশংসা কি ওর প্রাপ্য? এই সবকিছুই তাদের দেওয়া অবদান যারা ওকে আজ এই স্থানে এনে দাঁড় করিয়েছেন। রাজীব স্যার এলাহাবাদের এক নম্বর উকিল। ওর জুনিয়র হওয়া সহজ কাজ নয়। কিন্তু ও এই সুযোগ পেয়েছে ডক্টর আন্টির কৃপায়। স্যারের একমাত্র মেয়ের কোনও মতেই সন্তান হচ্ছিল না। আন্টি অবশেষে নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে আই. ভি. এফ. করে যমজ বাচ্চা করিয়ে দিয়েছিল নির্বিঘ্নে। একটা ছেলে একটা মেয়ে। রাজীব স্যার আন্টির কৃতজ্ঞতা মেটানোর জন্যই সদ্য আইন পাশ করা ফ্রেসার ল-ইয়ার কুসুম কুমারী সিংকে এক কথায় নিজের টিমে জায়গা দিয়েছিলেন। আর কুসুম আজ অবধি একটা মামলায়ও না হেরে স্যারের বেস্ট জুনিয়রের স্বীকৃতি পেয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার, স্যার ওকে রেপ কেসগুলোই বেশি দিচ্ছেন কেন? উনি কি তবে ওর অতীত জানেন? আন্টি হয়তো ওকে স্যারের টিমে ঢোকানোর জন্য বলেছে। আর উনিও ভেবেছেন, যে নিজে রেপ ভিক্টিম সে জানপ্রাণ দিয়ে অন্য ভিক্টিমের জন্য লড়বে। হয়তো এটাই ওর সাকসেসের কারণ।

কত বছর পার হয়ে গেল জীবনের ওপর দিয়ে। শুধু বেঁচে থাকার নাম যদি জীবন হয়, তাহলে এই জীবন ওর নিজের। কিন্তু প্রতিষ্ঠা, সাফল্য যদি জীবনের অঙ্গ হয় তাহলে ওর জীবনটা শুধুই কিছু দেবতুল্য মানুষের করুণা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রতি মুহূর্ত ওরা মনের ভেতরে চলাফেরা করেন। বাবাজী, মাজী, ভাভী, ভাইয়া, ডক্টর আঙ্কেল, আন্টি— এরা সবাই যেন ওর রক্ত মাংস মজ্জায়, ওর শ্বাস-প্রশ্বাসে মিশে গেছেন। এতকাল পরেও ও একটা ছোট্ট ঘটনাও ভোলেনি। ভোলেনি ওর নিজের মা-বাপ-বোনদের, ভোলেনি বলরাজকে, চৌরাহা চৌকের পিপল্ গাছের বেদিকে। তাহলে বাবুজী-মাজী, আন্টি-আঙ্কেলকে ভুলবে কেমন করে? একটু সময় পেলেই হরিয়াল ছুটে যায়, লখনৌ চলে যায় আপনজনের কাছে আপন ঘরে। অল্‌কা ভাভীর তিনটে বাচ্চার প্রিয় বুয়াজী (পিসি) যে ও! ভাভী যে দিন চলে গেল, সেই রাতে ওর মাথায় আর একবার স্যুইসাইডের পোকাটা কুটকুট করেছিল। কিন্তু সুমতি ওর শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করেছে হৃদয়ের গভীর থেকে। ভাভীর বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার সঙ্গে ওর সুইসাইডকে কানেক্ট করে লোকে নানারকম রটনা করবে। বাবুজীর উঁচু মাথাটাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে। না, না। একাজ করা মস্ত অন্যায় হবে। ভগবানকে সমস্যা মিটিয়ে দেবার জন্য কেঁদে কেঁদে ডেকেছিল রাতভর। তিনি নাকি একটা দরজা বন্ধ করলে আর একটা খুলে দেন শুনেছে ছোটবেলা থেকে। ওর পিতাজী দরজা বন্ধ করেছিল, বাবুজী নিজের ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। তিনিই এই বিশ্রি সমস্যাও মিটিয়ে দেবেন। ঠিক তাই হলো। একমাস পর ভাভীর বড়ে ভাইয়া বাবুজীকে জানালেন, ভাভী মা হতে চলেছে। শাহাগঞ্জে ডাক্তার দেখিয়ে কনফার্ম হয়ে জানাচ্ছেন। তবে এখুনি নিতে আসার দরকার নেই, খারাপ রাস্তার ঝাঁকুনিতে ক্ষতি হতে পারে, তাই তিনমাস পার হলে

উনিই নিয়ে আসবেন।

শর্মা বাড়িতে সেদিন আনন্দের বান ডেকেছিল। সবাই ভাভীর সব অপরাধ মার্জনা করে দিয়েছিল। মাজী পুজোর ঘরে সুন্দর-কাণ্ড পাঠ করছিলেন সুর করে। আর ওর নিজের বুকে চাপা পাথরটা ধপ্ করে নেমে গিয়েছিল। তিনমাস পূর্ণ হতে বাবুজী আর বড়ে ভাইয়া গাড়ি ভাড়া করে গিয়ে ভাভীকে সসম্মানে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। এ যেন এক অন্য মানুষ। মাতৃত্বের আগমনে পরিবর্তিত এক অন্য ভাভী। এসে সবাইকে প্রণাম করে কুসুমকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে ভাভী বলেছিল— 'ননদজী, তুম মেরী ছোটি বহন হো। মাফ কর সকোহী অপনি ভাভী কো? ম্যায়নে তুমকো তং কীয়া, ইতনা সঁতায়া, তুম নহন করতি রহী। কভি কিসিকে পাস মেরা শিকায়ত্ নহী কিয়া। কুসুম, তুম বহুত উঁচা হো আউর ম্যায় নীচ থী। মুঝে মাফ কর দো বহন। মেরী বচ্চে কী একলৌতি বুয়াজী, জরা মুসকুরা কে মেরী দিল মেঁ ঠণ্ডক ডালো জী।'— এরপর আর কোনওদিন ভাভী ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি, বরং আপন ননদ জ্ঞানে সম্মান দিয়ে চলেছে আজও। হরিয়ালয়ের বাড়িতে তখন সুখ আর শান্তি একসঙ্গে বিরাজ করছে।

ভাভীর প্রথম সন্তান ছেলে নর্ম্যাল ডেলিভারি হয়ে জন্ম নিল। বিকাশ ভাইয়া ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে সেন্ট্রাল গভর্মেন্ট জব পেয়ে হিমাচলে পোস্টেড হলো। হরিয়াল গার্লস স্কুল নতুন নামে অ্যাফিলিয়েশন পেয়ে গেল, তবে বাবুজীর হল্ট স্টেশনের দাবি খারিজ করে দিয়েছে রেলওয়ে। তারপর ওর ১২ ক্লাশের বোর্ড পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলো। ইউ পি বারো ক্লাসের বোর্ডে কুসুম কুমারী সিং টপ্ করেছে। হরিয়াল গ্রাম জশন্ বের করেছে, আতসবাজির জুলুসে গ্রামের মানুষ মেতেছে। মাস্টারজীর বাড়ির সামনে ভিড় জমেছে, কত কিছুই যে হয়েছে ওকে ঘিরে, ভাবলে লজ্জাও লাগে, আনন্দও হয়। ডক্টর আঙ্কেল বাবুজীকে বলেছেন, কুসুম লখনৌতে এসে কলেজে পড়ুক, ওদের কাছে থেকে। প্রকাশ ভাইয়াও চায় কুসুম ভালো কলেজে পড়ুক, কিন্তু ও নিজে চায় না। ভাভীর বাচ্চা ছোট, ও চলে গেলে মা-জী, ভাভী দুজনেরই খুব মুশকিল হবে। তার চেয়ে ও শাহাগঞ্জ কলেজে ভর্তি হলে বাড়িতে থেকে পড়তে পারবে। বাচ্চাকে সামলাতে পারবে, মাজীর মুশকিল আসান হবে।

প্রকাশ রেগে বলল— 'টপার হয়ে তুই শাহাগঞ্জ কলেজে পড়বি? তোর মাথা খারাপ হয়েছে? শুনে নাও তুমি লখনৌ যাচ্ছো।'

তখন আর ও নিজেকে আশ্রিতা বলে ভাবত না, এ বাড়ির মেয়ে, ওদের বোন বলে ভাবতে ওরাই শিখিয়েছিল। তাই মুখ খুলে তর্ক করে নিজের ইচ্ছে জাহির করতে আর বাধা ছিল না। বড়ে ভাইয়াকে মুখের ওপর বলে দিল— 'তুমি যাই বল না কেন, এখন আমি শাহাগঞ্জ কলেজেই যাবো। পরে আইন পড়ার সময় লখনৌতে থেকে পড়ব। বাবুজীকে বলে দিয়েছি, কই বাবুজী তো জোর করেননি? হরিয়াল স্কুল থেকে যদি টপ করতে পারি তাহলে শাহাগঞ্জ কলেজ থেকেও অনার্সে ফার্স্টক্লাশ পেতে পারব, বুঝলে?'

প্রকাশ তবুও ছাড়ে না, বলে— 'রোজ ১৭ কিমি যেতে আসতে জিভ বেরিয়ে যাবে। পড়বি কখন আর মা-ভাভীকে সাহায্য করবি কখন?'

ও বলে— 'সব হবে। বাবুজী ট্রেকারের ব্যবস্থা করবেন। এখান থেকে আমি একা তো নই, আরও ৭-৮ জন ছেলে-মেয়ে যাবে। তুমি বেশি ভ্যানতারা করো না ভাইয়া।'

শাহাগঞ্জ কলেজ থেকেই পল সাইন্সে অনার্স আর কম্বিনেশনে হিস্ট্রি রেখে ফার্স্টক্লাস পেয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। ততদিনে ভাইয়ার ছেলে বড় হয়ে গেছে, ওকে চোখে চোখে রাখার দিন ফুরিয়েছে। আন্টির বাড়িতে সমাদরে থেকে 'বার অ্যাট ল' হয়ে বেরিয়ে রাজীব স্যারের জুনিয়র হয়ে আজ এখানে বসে আছে। ইতিমধ্যে ভাভীর একটি মেয়েও হয়ে গেছে। যাকে ও যত্ন করতে পারেনি তখন, এখন যখন বাড়ি যায়, তখন গোলগাল ডল পুতুলটাকে ঘাঁটে। এখন গৌরী আন্টির বাড়িতে নয়, একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে একাই থাকে। আঙ্কেলই ফ্ল্যাট ঠিক করে দিয়ে বলেছিল— 'তোমার একা থাকার ইচ্ছেতে আমি বাধা দিতে চাই না কুসুম। তুমি আজ পূর্ণবয়স্ক, সাবলম্বী মেয়ে। নিজের একটা ঘর সবাই আশা করে। তোমার আশা পূর্ণ হয়েছে আমরা তাতেই খুশি। অনেক সংগ্রাম করে তুমি সমাজে নিজের একটা মূল্যবান পরিচয় অর্জন করতে পেরেছ, ক'জন মেয়ে পারে বলো তো?'

— 'এতে আমার কোনও ক্রেডিট নেই আঙ্কেল। ক্রেডিট বাবুজীর আর আপনাদের। আমি তো শুধু একটু পড়েছি মাত্র। ঐটুকুই আমার অবদান। আমাকে এখানে পৌঁছানোর পথ আপনারা সুগম করে দিয়েছেন। তা না হলে আমি হয়তো আজ কোনও রেড লাইট এরিয়াতে ফ্লেশ ট্রেড করতাম।'

স্যারের দেওয়া নতুন মামলা নিয়ে বুঁদ হয়ে স্টাডি করছে কুসুম। পুলিশ ইনভেস্টিগেশন ফাইল, চার্জশিট ফাইল, ধৃত দুই ব্যক্তির ফটো, এখনও পলাতক কিং পিনয়ের চেহারার স্কেচ বারবার পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ খুঁটিয়ে দেখছে। কেন জানি মনে হচ্ছে এই মামলা রাজনৈতিক শত্রুতা থেকে উৎপন্ন। ভিক্টিম মেয়ের বর্ণনা থেকে আঁকা স্কেচের লোকটা কালো চশমা পরা। চোখ না দেখলে বোঝা কিংবা চেনা খুব মুশকিল হয়। কারণ, মানুষের চোখ কথা বলে। ঢাকা থাকলে কথা বোঝা যায় না। মেয়েটা কি

তাহলে লোকটাকে সব সময় কালো চশমা পরা অবস্থায় দেখেছে? তাহলে তো ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

বড় বড় ক্রিমিনাল ল-ইয়াররা শুধু পুলিশের উপর নির্ভর করেন না। প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির সঙ্গে কনট্রাক্ট থাকে তাদের। রাজীব শ্রীবাস্তবেরও আছে রিটায়ার্ড ব্রিগেডিয়ার জশপাল সিংয়ের এজেন্সির সঙ্গে। এরা পুলিশের চেয়েও অনেক বেশি চ্যালেঞ্জ নিয়ে গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত অনুসন্ধান করে তথ্য সংগ্রহ করে দেয়। রাজীব ইতিমধ্যে এজেন্সিকে কাজে বহাল করে দিয়েছেন। পুলিশও নিউজ পেপারে কালো চশমা লোকটার ছবি ছেপে ইনফর্মেশন চেয়েছে। এখনও খবর পাওয়া যায়নি। তার জুনিয়র মিস কে কে সিং এই ডিটেকটিভ এজেন্সিকে সঙ্গে নিয়ে কেস ইনভেস্টিগেশনে নেমেছে।

ফোনে যোগাযোগ করে কুসুম একদিন এলো ১৬ বছরের মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে। মা সঙ্গে করে ড্রাইং রুমে নিয়ে এলেন। ঠিক ওর মতোই মেয়েটা যেন নিজেকেই অপরাধী বলে ভাবছে। বিষণ্ণ, চোখের নীচে কালি পড়েছে নিদ্রাহীনতায়। কুসুম ওর মাকে বলল— 'ম্যাম, আমি একা ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।' —উনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন— 'নিশ্চয়ই।' মহিলা চলে গেলে কুসুম ওর হাত ধরে বলল— 'নীলম, মুখ তোলো। আমার দিকে তাকাও। আমি নিজে একজন রেপ ভিক্টিম। ১৭ বছর বয়স ছিল তখন। তোমার মনের অবস্থা আমার চেয়ে আর কে বেশি জানবে? শরীর একটা মন্দির নীলম, শরীর ঈশ্বরের দান। যেখানে আত্মা থাকে সেখানে ঈশ্বরও বাস করেন, তাই শরীর কখনও অপবিত্র হয় না। আমি তোমার উকিল, আমাকে দেখে কি মনে হয় যে একদিন আমাকে কেউ বলাৎকার করেছিল? আমি আর পবিত্র নই?'

নীলম অবাক চোখে সুন্দর মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকে।— 'কিন্তু আমার কথা যে প্রচার হয়ে গেছে? সারা দেশ জেনে গেছে।'

— 'জানুক। কেউ তোমাকে তো দোষ দেয়নি। মানুষ অপরাধীর সাজা চাইছে, নীলম। আমি বেশি প্রশ্ন করব না। একটাই কথা জানতে এসেছে, যা কেস শিটে নেই। আচ্ছা, ঐ কালো চশমা পরা লোকটার মুখ তুমি দেখেছ, ওর চোখে কি সব সময় কালো চশমা থাকে? ও বেঁটে না লম্বা?'

— 'ঐ লোকটাকে দুবার দেখেছি, একবার দিনে একবার রাতে। দুবারই চোখে চশমা ছিল। ওর হাতে গালে লম্বা লম্বা সার্জিক্যাল স্টিচের নিশান আছে। তবে ও আমাকে রেপ করেনি, করেছে অন্য দুজন। ও ওই দুজনকে আদেশ করত। ও লম্বা, মাঝারি স্বাস্থ্য গায়ের রং গেঁহুয়া।'

— 'কী আদেশ করত?'

— 'মোবাইল থেকে নয়, পাবলিক কল বুথে কয়েন ফেলে ফোন করে বাড়িতে ধমকি দিত। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে পাঁচ কোটি টাকা নির্দিষ্ট স্থানে না রাখলে আমাকে মেরে ফেলবে, একথা বলত। প্রথম দুদিন কিচ্ছু করেনি আমাকে, খেতেও দিয়েছে। তৃতীয় দিনে খেতে দেয়নি, সেই রাতে লোকটা এসে আমাকে বলেছে, তোর বাপ টাকা দেয়নি, এবার তোকে মরতে হবে। অন্য ছেলে দুটোকে বলল, এখন তোরা ওকে নিয়ে মজা লুঠতে পারিস, তবে যাই করিস ওর হাত দুটো পেছনে বেঁধে করবি। হাত কী জিনিস জানিস না। সেদিনই ওরা আমার হাত বেঁধে...।'

কুসুমের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল... বলরাজ? নীলমের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। হাতে-গালে লম্বা লম্বা স্টিচের নিশান, হাত বেঁধে, হাত কী জিনিস জানিস না এই উক্তি, চোখের গর্ত ঢাকতে দিনে রাতে কালো চশমা, লম্বা, গমের মতো গায়ের রং... হ্যাঁ হ্যাঁ, এ বলরাজ ছাড়া আর কেউ নয়। ও রেপ করবে কী করে? আমি তো নরুন দিয়ে ওর নিম্নাঙ্গ... ও মাই গড্! তুমি শয়তানটাকে শেষপর্যন্ত আমার হাতে এনে দিলে ঠাকুর!

কোর্ট আওয়ার্স শেষ হয়ে গেছে, রাজীব স্যার বাড়ি চলে গেছেন। উত্তেজিত কুসুমকে বললেন— 'বাড়িতে চলে এসো। গলা শুনে মনে হচ্ছে জবরদস্ত ক্লু পেয়েছে। দেরি করো না।'

ফিরে আসার পথে কুসুম উত্তেজনা দমন করে নিজেকে শান্ত করল। এখন উল্লাস নয় শুধু কাজ। গুন্ডা বলরাজ, ওর মাফিয়া ডন গুন্ডা চাচা— সব কটাকে যদি একসঙ্গে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারি, তবে শান্তি হবে। ওর স্থির বিশ্বাস বলরাজ পশ্চিম ইউ পি-তে ওদের গ্রাম বড়কা তালাও-এ আত্মগোপন করে রয়েছে। কারণ ওই অজ পাড়াগাঁয়ের নামও কেউ জানে না। এই গ্রামে বলরাজদের রাজত্ব চলে আসছে কোন অতীত থেকে। ওদের শাসন মেনে চলতে অভ্যস্থ হয়ে গেছে গ্রামবাসীরা। প্রতিবাদ মানেই অত্যাচারিত হওয়া। তাই কারও বুকের পাটা নেই বলরাজকে চিনিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

প্রায় দেড় ঘণ্টা স্যারের বাড়ির চেম্বারে বসে সবিস্তারে আলোচনা হয়। পরবর্তী পদক্ষেপ হবে ডিটেকটিভ এজেন্টদের ঐ নাম না জানা বড়কা তালাও গাঁয়ে কিষানের ছদ্মবেশে খোঁজখবর নিতে যাওয়া। পাক্কা খবর পেলে পুলিশ যাবে। তার আগে রাজীব পুলিশকে কিছু জানাবেন না। কারণ অ্যারেস্টেড ছেলে দুটোর হয়ে মামলা লড়ার জন্য বহুত তাগড়া উকিল লাগানো হয়েছে, যার এক ঘণ্টার ফিজ দেবার ক্ষমতাও ঐ ছুঁচো দুটোর নেই। এর মানে ওদের পেছনে রাঘব বোয়াল কেউ একজন আছে। সে অনায়াসে পুলিশ কিনতে পারে। ব্রিগেডিয়ার সিং তার এক্স আর্মি জওয়ান ডিটেকটিভদের পাঠিয়ে গ্রাম ব্লক

করে রাখবেন, যাতে বলরাজ পালাতে না পারে। বুঝলে কুসুম কাউকে পুরো বিশ্বাস হয় না।

কুসুম বলে— 'সে জন্যই পুলিশ পার্টির সঙ্গে আমি নিজে যেতে চেয়েছি। ওর লুকিয়ে পড়ার জায়গাগুলো আমার থেকে ভালো আর কেউ জানবে স্যার? পেছনে যে ওরাই আছে তাতে সন্দেহ নেই।'

—'না। তুমি প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছ তুমিই বললে। আর নয়। এই মকদ্দমা আমিই লড়ব তোমার আইডেনটিটি গোপন রাখার জন্য। তুমি ওর যে হাল করেছ, তাতে ওরা কি তোমাকে পেলে ছেড়ে দেবে? আমার সূত্র খবর এনেছে, ওর চাচার বিরুদ্ধেও নতুন রুলিং পার্টি পাঞ্জাব বর্ডার দিয়ে ড্রাগ আমদানি নিয়ে অনুসন্ধান করছে। দ্যাখো, চাচা-ভাতিজা দুজনই জেলে যায় কিনা? নীলমের জ্যাঠা এখন কানুন মন্ত্রী, উনি চাচা-ভাতিজার জমজমাট কারবার বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছেন, এই কারণেই প্রতিশোধের জন্য নীলম অপহরণ কাণ্ড।'

ড্রাগ, মার্ডার, অ্যাবডাকশন, রেপ, অ্যাবেটমেন্ট টু স্যুইসাইড অফ ফোর ওমেন— পাঁচটা মারাত্মক চার্জে জড়িয়ে ফেলেছেন। তথ্য প্রমাণ নিয়ে তৈরি রাজীব শ্রীবাস্তব। সাহস জুগিয়ে, মোটা টাকা দিয়ে গ্রাম থেকে কিছু সাক্ষী জোগাড় করে এনেছে ব্রিগেডিয়ার এজেন্সি। এই মামলা তার প্রেস্টিজ ফাইট। টাকা কামাবার জন্য লড়ছেন না, কুসুম আর নীলমকে ন্যায় বিচার পাইয়ে দেবার জন্য গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে লড়ছেন। জিততে তাকে হবেই বাই হুক অর বাই ক্রুক। টাকা বহু কামিয়েছেন, আগামীতেও কত কামাবেন। কিন্তু এই মামলা জিতে যে আনন্দ পাবেন, সেটা তার আইনি জীবনে ক্যাপিটেল হয়ে থাকবে।

দুই পক্ষের দুধর্ষ লড়াই চলেছে প্রত্যেকটা শুনানির তারিখে। রাজীবের সাক্ষীরা নিজেদের মৃত মেয়ে, পুত্রবধূর পুরনো ফটো সঙ্গে নিয়ে এসে দেখিয়ে কেঁদেছে সাক্ষ্য দেবার সময়। সাক্ষ্য কুসুমও দিয়েছে জোর করে তবে কোর্ট

রুমে নয়, জজ সাহেবের চেম্বারে বসে বলার অনুমতি নিয়ে। মাস্টারজী, ডক্টর অরবিন্দ কুমার, ডক্টর গৌরী কুমারও গোপনীয়তা রক্ষার নিমিত্ত কুসুমের সঙ্গে তিনজন জজের সামনে বসে নিরালায় সাক্ষী দিয়েছেন। এই নিয়ম কোর্টের আছে, রাজীব তাই আবেদন করে মঞ্জুর করিয়ে রেখেছিলেন। অপোনেন্ট তাগড়া উকিল মশাইয়ের সমস্ত যুক্তি রাজীব খান খান করে ভেঙে দিয়ে বিজয়ের পথে যাচ্ছেন। তিনি বলরাজের জন্য আদালতের কাছে মৃত্যুদণ্ড দেবার আর্জি পেশ করলেন। রায় বের হবার দিন পুলিশ ব্যারিকেড করে মিডিয়ার ভিড় রুখেছে। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই নীলম নির্ভীক হয়ে সাওয়ালের জবাব দিয়েছে কোর্ট রুমে দাঁড়িয়ে। আঙুল তুলে তুলে দোষীদের সনাক্ত করেছে। কেস ওঠার আগে কুসুম ঘনঘন ওদের বাড়িতে গিয়ে নীলমকে সাহস যুগিয়েছে। ষোলো বছরের নীলমের ভয় দূর করে শক্তি এনেছে মনে। একথা স্যারও জানেন না, ও বলেনি ওনাকে।

শুনানি চলার সময় আড়াল থেকে ও বলরাজকে দেখেছে। কালো চশমাটা নেই, বোধহয় পুলিশ কেড়ে নিয়েছে। ডান চোখের স্থানে একটা অন্ধকার গর্ত। গালময় স্টিচের পুরনো দাগে ভরা মুখ। ও ওর পিতাজীকে, গ্রামের অন্যদেরও দেখেছে। ওর পিতাজীও ফটো নিয়ে এসেছিল। সাক্ষী দেবার সময় বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া মানুষটাও কেঁদেছে সেদিন। বলেছে, 'আমার মেয়ে ঘটনার পর ঘরেই এসেছিল হুজুর। আমিই ভয়ে ওকে ঘরে থাকতে দিতে পারিনি। বলেছিলাম কোথাও চলে যা। সেই যে চলে গেল আর আসেনি। হয়তো ও খুদখুশি করে মরে গেছে। বড় খুবসুরত, বড় ভালো মেয়ে ছিল ও।'— শুনে কুসুমের কেন যে চোখে জল এলো জানে না। বাপের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেও জাগেনি মনে, তবে কান্না এলো কেন কে জানে!

বিচারক বলরাজকে ফাঁসির আদেশ ঘোষণা করে আদেশপত্রে সই করে কলমের মুখ ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন। কুসুমের মুখে আবার চাঁদের জ্যোৎস্না ফিরে এলো। ওরা পরে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছিল, কিন্তু মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের আদেশ বহাল রেখেছেন। রাষ্ট্রপতি প্রাণভিক্ষার আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন। কুসুম এখন ফাঁসির দিনের অপেক্ষায় আছে। আর রাজীব শ্রীবাস্তব তার প্রেস্টিজ ফাইট জিতে মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন একথা নিজেই বলেছেন জুনিয়ারদের কাছে।

পরিশেষে

—'হ্যাঁরে কুসুম তুই কি সংসার পাতবি না? সাদির কথা বললে অন্য কথা শুরু করে দিস। আমরা আর কতদিন থাকব? তোর জীবন কী করে কাটবে বল তো? বয়স তো আর বসে নেই, সে বেড়েই চলেছে। তোকে একা রেখে কী করে যাই বল তো? শুনি কত ভালো ভালো ছেলে তোকে সাদির প্রস্তাব দিয়েছে। তুই খারিজ করে দিয়েছিস— কেন?

— 'আমি খুব ভালো আছি বাবুজী। একদম চিন্তা করতে হবে না। আমার দুই ভাইয়া-ভাভীজী আছে, ভাগ্নে-ভাগ্নী আছে, একা নাকি আমি! আমার কাজের সঙ্গেই সাদি হয়ে গেছে বলে ভাবুন না। আপনি তো বলেন, কর্মই ধর্ম। আমি আমার কর্মকে সঙ্গী করে খুব সুখে শান্তিতে আছি। আজাদির স্বাদ অনুভব করছি বাবুজী, বিশ্বাস করুন। যত দিন আপনি আছেন, আমি নিজের জন্য নিশ্চিন্ত থাকব, কারণ নতুন জন্ম দিয়ে অলিখিতভাবে আপনিই আমার পিতা, আপনিই আমার ঈশ্বর। আমি তো ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য হয়ে আছি। পিতার ছত্রছায়ায় বড় হয়েছি। আমার কিসের ভয়?'

পরমেশ্বর তর্ক করেন না। কুসুম ব্যক্তিত্বশালী পূর্ণবয়স্কা পরিণত নারী, ও নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকবে এই কথা জানা হয়ে গেছে অনেক বছর আগেই।

শুভ দুর্গাপূজার প্রীতি

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

— জনৈক শুভানুধ্যায়ী

সিনেমাওয়ালা ছবিতে পরান বন্দ্যোপাধ্যায়।

একপর্দা প্রেক্ষাগৃহের মায়া

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকেই লক্ষ্য করেছেন গত দশ বছর ধরেই কী বাঙলা কী হিন্দি, কী বিদেশি চলচ্চিত্র দেখানোর এক পর্দায় (Single screen) যেখানে একটিই মাত্র ছবি দুপুর সন্ধ্যে রাত্রি মিলিয়ে দেখানো হতো সেইসব প্রেক্ষাগৃহগুলি একে একে যেন নিয়তি নির্দিষ্ট অলঙ্ঘ্যতায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হয়তো সময়ের দাবিতে, দর্শক চরিত্র ও রুচির বিবর্তনের কারণে এটিই স্বাভাবিক পরিণতি। আজকের দর্শক হয়তো চলচ্চিত্র উপভোগ করার সময় আরও বেশি পারিপার্শ্বিক স্বাচ্ছন্দ্য অভিলাষী। এগুলি হতেই পারে। এর অন্তিম প্রতিক্রিয়ায়— দর্শকের প্রেক্ষাগৃহমুখী না হওয়া।

টি-ভি, ইউ টিউব বা ডিভিডি-তে ছবি দেখে নেওয়ার সহজ সুযোগ থাকাও আর একটি বড় কারণ। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব একদিকে যেমন ছবি যিনি বিভিন্ন হলে দেখাতে পাঠানোর (Distributor) ও যিনি হল মালিক বা ছবির প্রদর্শনের (exhibition) সঙ্গে যুক্ত তাঁদের অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের ওপর প্রতিফলিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহের অবলুপ্তির পথে সক্রিয় ভূমিকাও নেয়। কিন্তু সেই অর্থনৈতিক কারণ ও আদায় উশুল নিয়ে এই নিবন্ধ নয়।

কলকাতার এসপ্ল্যানেড বা ধর্মতলা অঞ্চলটি সেই স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় থেকেই শহরের বিশেষ করে চলচ্চিত্রের দর্শক আকর্ষণের ক্ষেত্রে আজকের ভাষায় একটি SEZ (Special economic zone)-এর মতো স্পেশ্যাল এন্টারটেনমেন্ট জোন বা বিশেষ বিনোদন ক্ষেত্রের মর্যাদা পেত। সদ্য যৌবনাগত তরুণ তরুণীর মন একই অঞ্চলে আট দশটি প্রেক্ষাগৃহের চিত্র বিচিত্র সাজে সজ্জিত বহিরঙ্গ ও নায়ক নায়িকা, খলনায়কের নানান বিভঙ্গের বিশালকৃতির ব্যানারগুলি দেখে অনায়াসেই এক মোহগ্রস্ত পরিস্থিতির মোকাবিলায় আক্রান্ত হয়ে পড়ত। লাইট হাউস, নিউ এম্পায়ার, গ্লোব, মিনার্ভা, টাইগার, রক্সি, রিগাল, এলিট প্রভৃতির সে এক সম্মিলিত হাতছানি!

একসময়ের চিত্তাকর্ষক নামধারী লাইট হাউস বহুকাল আগেই জামাকাপড় প্রসাধনীর বিক্রয় কেন্দ্রে পরিণত। এর পাশেই রয়েছে নিউ এম্পয়ার সিনেমা। এটি পরাধীন ভারতে (১৯৩২) প্রথমে

অপেরা রূপে থাকাকালীন এখানে রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত নটীর পূজা প্রদর্শনের বিরল গৌরবের অধিকারী। নিউ এম্পায়ার শুরুর সময় থেকে বরাবর হলিউড ছবি দেখালেও এখন সে রেওয়াজ নেই। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসভার হেরিটেজ সৌধের তালিকায় পড়া এই হলটি অধুনা নানাবিধ আইসক্রিম পার্লার, মদিরালয় ইত্যাদির সাহচর্যে এখনও টিকে আছে। মনে পড়ে এখানেই এক বছর ধরে চলেছিল কলকাতা কাঁপানো ভূতের ছবি 'exorcist'। প্রায়শই খবর আসত এত জন দর্শক অজ্ঞান হয়ে গেল। কখনও বা এতজন হলে ভয়ে কাঁপতে লাগল। এসব গালগল্প থাক। এই ছবি কোটি কোটি টাকা বিশ্বব্যাপী রোজগার করেছিল। আজকের ভারতে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা নিয়ে প্রায় ১৮০০ ছবি নির্মিত হয়। সিনেমা যে আজ হেলাফেলার জিনিস এমন আর নেই। কোটি কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রাও বহু বড় বাজেটের হিন্দি ছবি এখন দেশে নিয়ে আসে। প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য অনেক নান্দনিক গুণসম্পন্ন ছবিও এখন দেশের বাইরে প্রদর্শিত হচ্ছে।

বিশ্বের এমন একটি চিত্ররূপময় নান্দনিক সৃষ্টির প্রকাশস্থলগুলির ক্রমিক অবলুপ্তি কেমন একটা করুণ নস্টালজিয়ার জন্ম দেয়। এটি সে অর্থে নিতান্তই সেই বিগত শতাব্দীর ৬০ থেকে ৯০-এর দশক পর্যন্ত যারা প্রেক্ষাগৃহমুখী হতেন তারা খানিকটা ভাগ করে নিতে পারতেন। সদ্যই কাগজে বেরোল এলিট সিনেমা ১ জুন থেকে আর পর্দা ওঠাবে না। এক পর্দা সিনেমা হলের বিলয়ের কথা বলতে গেলে তাদের সঙ্গে যুক্ত বিরল গৌরবগাথাগুলিরও তো কিছুটা উল্লেখ করতে হবে।

ইয়োরোপ বা হলিউডে সিনেমা বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে জাঁকিয়ে বসলেও স্বাভাবিক কারণে একটি পরাধীন দেশে তার নির্মাণকার্য একটু দেরিতে শুরু হয়। সেই অর্থে ১৯৩১ সালে বিলিতি প্রযুক্তিবিদ বি এন সরকার-এর নিউ থিয়েটার্স ও ১৯৩৪ সালে হিমাংশু রায়ের 'বম্বে টকিজ স্টুডিও' ভারতে চলচ্চিত্র নির্মাণের পথিকৃতের মর্যাদা নিশ্চয় দাবি করবে। কিন্তু এই সমস্ত ছবির অভিনেতা অভিনেত্রী কলাকুশলীরা তো তখন নিজেদের একটি সম্পূর্ণ নতুন যৌথ শিল্প মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত করার, তাকে আয়ত্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। তাঁরা নিয়ম করে দেখতেন বিদেশি ছবি। আর তাঁদের নান্দনিকতাবোধ নির্মাণের অনুশীলন কেন্দ্র ছিল এই আজকের বিলীয়মান ধর্মতলার প্রেক্ষাগৃহগুলি। সত্যজিৎ রায়ের লেখালিখি থেকে জানা যায়, তিনি নিয়মিত মেট্রো বা গ্লোব সিনেমায় রাতের শো'তে হলিউডি ছবি দেখতে যেতেন। উত্তমকুমার যেতেন তাঁর গুরু Ronald Colman-এর ছবি দেখতে। এই দেখা থেকেই Random Harvest-এর ছায়ায় সৃষ্টি হয়েছিল বাঙালির সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ রোমান্স 'হারানো সুর'।

দ্য বাইসাইকেল থিপ ছবির পোস্টার।

মেট্রো সিনেমায় তাঁর বাবা চিফ অপারেটর বলাইবাবু হওয়ায় ছেলের নিজেকে তৈরি করতে বাড়তি সুবিধা হয়েছিল। কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম উৎসবের ছবিগুলিও এই হলগুলিতেই তখন প্রদর্শিত হতো। কেননা তখন তো মাল্টিপ্লেক্স ছিল না। এই উৎসবেই একবার একটি অবিস্মরণীয় দৃশ্যের সাক্ষী হয়েছিলাম, আজ হারিয়ে যাওয়া মেট্রো সিনেমায়। সেবার জাপানের বিখ্যাত পরিচালক ওজুর The boy ছবিটি সন্ধের শোতে দেওয়া হয়েছিল। তখন ডিভিডি নেই যে ছবি না দেখতে পেলে কিনে নিলেই হবে। তিন ঘণ্টার প্রলম্বিত ছবি ভাঙার পর আলো জ্বলতেই বিস্ময়ান্বিত হয়ে দেখলাম, মহীরূহ সদৃশ সত্যজিৎ রায়কে। একটি সাধারণ ঢোলা পাঞ্জাবি পাজামা পরে রয়েছেন। হলে যেন একটি চাপা কলতান শোনা যেতে লাগল। আশপাশ থেকে অঙ্কুর বেরোনোর মতো পরপর উঠে দাঁড়াচ্ছেন বসন্ত চৌধুরী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার,রবি ঘোষ, ছায়াদেবী, বিকাশ রায়ের মতো আরও কত না বিখ্যাত অভিনেতা। মাথা নিচু করে অভিবাদন জানাচ্ছেন চলচ্চিত্রের পুরোধা পুরুষটিকে। এতবড় এক জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে হয়তো ৩৫ বছর আগে খরচা

ম্যাকানাস গোল্ড ছবিতে গ্রেগরি পেক এবং ওমর শরিফ।

পড়েছিল টিকিটের দাম হিসেবে বেশি হলে ২০ টাকা। এখন একটা সিনেমা মাল্টিপ্লেক্স-এ তাও আবার সময় ভেদে দামের তফাত নিয়ে ন্যূনতম ১০০ থেকে ১৫০ টাকা। টিকিট কাটারও হ্যাপা উচ্চ প্রজাতির মোবাইল ফোনে আবদ্ধ। বহু সিঁড়ি, escalator ভেঙে সেখানে প্রবেশ করতে হয়। বাজার অনুযায়ী জানি না, দাম বেশি কিনা। তবে সিনেমার যারা আপামর দর্শক সেই বয়ঃসন্ধির তরুণ-তরুণীরা কি এত টাকা জোগাড় করতে পারে? না পারলে তো তারা মায়ালোক থেকে বাদ পড়ে গেল!

ফিরে যাই আগের কথায়। এই বন্ধ হওয়া মেট্রোতেই দর্শক একদিন ছায়াছবির ইন্দ্রজালের সন্ধান পেয়েছিলেন— 'বেন হুর' (রথ ছোটানোর দৃশ্য) বা কুয়ো ভ্যাডিসে। গ্লোব সিনেমায় উচ্চ মাধ্যমিক পাশের সময় বরাবর বিস্ফারিত নেত্রে স্বগোত্রীয়দের সঙ্গে রাস্তা থেকে দর্শক হয়েছিলাম রানি ক্লিওপেট্রার বিস্ফোরক শরীরি সৌকর্যের। রিচার্ড বার্টন (যিনি আবার ক্লিওপেট্রা রূপী এলিজাবেথ টেলরের স্বামীও বটে) ও বিশ্ববিশ্রুত প্রবীণ অভিনেতা রেক্স হ্যারিসনের অতিকায় সব পোস্টার এক বাক্যহীন কুহকের সৃষ্টি করেছিল। বাড়ি থেকে দেখানো হয়েছিল তৎকালীন সীমিত প্রযুক্তির যুগে তাকলাগানো Ten Commandments। অনেক পরে ৭০-এর দশকে ভারতের সর্বকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিনোদন সফল ছবি 'শোলে' এই এলিট ও আগেই মৃত জ্যোতি সিনেমার তৎকালীন স্টিরিওফোনিক সাউণ্ডে সব রেকর্ড ভেঙে কয়েক বছর চলেছিল। বহু মানুষ রোজই জ্যোতি সিনেমায় গিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরতেন 'হাউসফুল'। এলিটে অমিতাভ বচ্চনের ৮৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'শাহেনশাহ'র লাইন পড়েছিল মেট্রো সিনেমা ছাড়িয়ে। পুলিশকে যানবাহন সামলানোর সঙ্গে হাল্কা লাঠি চালাতেও হয়েছিল। জনতা সিনেমার ভালোবাসায় খুশি মনে তা মেনে নিয়েছিল। চলচ্চিত্রপ্রেমীদের একটি যুগান্ত ঘনিয়ে আসছে বলেই যেন নানা স্মৃতি ভিড় করে আসছে। আজকের প্রবীণরা কি ভুলতে পারবেন এলিট সিনেমায় দর্শকদের Mckanas gold-এর স্বর্ণ অভিযান বা Guns of Navarone-এর স্মৃতি। মনে রাখতে হবে ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর '৭০-এর দশক অবধি যুদ্ধ নিয়ে মানুষের কৌতূহল ছিল অপরিসীম। তেমনই ছবি 'Bridge on the River Quai' গ্লোব সিনেমার পর্দা কাঁপিয়ে ছিল বহুদিন। তখন তো দেশে সাহেব ছিল না। ছবিগুলি মধ্যবিত্ত বাঙালি দর্শকের, হবু ছবি নির্মাতাদের রুচি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল বলা যেতে পারে।

এক-পর্দা প্রেক্ষাগৃহের অবসান অনেকটা যুদ্ধের সময় পোড়ামাটি নীতির মতো দ্রুত ধূলিসাৎ করে দিয়ে যাচ্ছে তাকে

ঘিরে থাকা স্মৃতির সৌধগুলিকে। রিচার্ড অ্যাটেনবরোর রেকর্ড অস্কারে ভূষিত জাতির পিতা গান্ধীকে নিয়ে ৫ ঘণ্টার চলচ্চিত্র 'গান্ধী' বিতর্কহীন ভাবে দীর্ঘদিন অধুনা নীরব গ্লোব সিনেমাকে কলরবমুখরিত রেখেছিল। এই অবলুপ্তি পর্বে কলকাতার শেষ উন্মাদনা শতাব্দী শেষের 'The Titanic' দিয়ে শেষ করব। এটিও বছর পার করা ছবি। আজকের মাল্টিপ্লেক্সওয়ালারা কেউ দম রেখে বলতে পারবেন যে তারা একটি ছবিকে এক বছর চালাতে পেরেছেন?

আসলে এসবই কালের গতি, তবে তার পদচিহ্নকে তো এড়াবার উপায় নেই। চিন্তাস্রোতে তার উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। আর তা যে করা যায় না তার অকাট্য প্রমাণ রাখলেন যশস্বী পরিচালক শ্রী কৌশিক গাঙ্গুলী। একালে সিনেমা হলগুলির অপসৃয়মান মায়ায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছেন কৌশিক। আস্ত একটা হারানো দিনের মেঘলা আকাশের বেদনাময় ছবি 'সিনেমাওয়ালা' উপহার দিলেন চলচ্চিত্রপ্রেমীদের। একটি দীর্ঘ কালপর্বের সাক্ষী হয়ে পথ প্রান্তে দাঁড়ানো আটপৌরে আবহের একপর্দার প্রেক্ষাগৃহের আবেদন যে সর্বজনীন হতে পারে, তা প্রমাণ করল প্রথম ভারতীয় হিসাবে তাঁর Unesco প্রবর্তিত International Council for Film Television & Audio Visual Communication (ICFT) Paris & Unesco -এর প্রবাদপ্রতিম ইতালীয় পরিচালক ফ্রেডরিকো ফেলেনির (La Dolu Vita খ্যাত) নামাঙ্কিত সেরা পরিচালকের পুরস্কারটি জিতে নেওয়ায়। দেশের মধ্যে Filmfare (eastern) -এর দেওয়া সেরা ছবি, সেরা পরিচালক, সেরা অভিনেতার মতো সমস্ত বড় পুরস্কারে ছবিটি ভূষিত। ছবির মুখ্য চরিত্রে পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যি সত্যিই ডিজিটাল সিনেমার কাছে হেরে যাওয়া অর্থনৈতিক ভাবে যত না মানসিকভাবে তার চেয়ে ঢের বেশি সর্বস্বান্ত এক মফসস্‌ল প্রেক্ষাগৃহের মালিককে অবিস্মরণীয় করে রাখলেন। প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার অন্তিমলগ্নে তিনি হলে আগুন লাগিয়ে দেন।

ছবিতে তাঁর কর্মজীবনের চিরসঙ্গী হরি তার প্রাণপ্রিয় প্রোজেক্টরটি যখন বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তেই আত্মহত্যা করে। ওপরতলার ব্যালকনির আসনগুলির মধ্যপথ দিয়ে যখন প্রজেক্টরের আলোয় বাতাসে ভাসমান ধূলিকণাগুলি ঝিকমিক করে উঠত, সৃষ্টি হোত এক অলীক নক্ষত্রপুঞ্জের গতিপথ। এই রশ্মিই প্রলম্বিত হয়ে আছড়ে পড়ত পর্দায়। জন্ম হতো কল্পলোকের। সারিবদ্ধ আবিষ্ট দর্শককূল পর্দার অভিনেতাদের কখনও আনন্দের কখনও বেদনায় বিদ্ধ হয়ে অশ্রুপাত করতেন। দর্শক মনে তৈরি হতো এক স্মৃতির ইমারত। সেই প্রজেক্টর আজ অতীত। কিন্তু তার গমন পথের স্মৃতি বিশেষ করে কিশোর বা তরুণ মনে এক স্থায়ী আসন নির্মাণ করেছে।

এক যৌথ নান্দনিক সৃষ্টি হিসাবে চলচ্চিত্রই আমাদের অতীতের সবথেকে বুদ্ধিদীপ্ত সংরক্ষণ মাধ্যম। এই সূত্রে চলচ্চিত্রের এক ধরনের ত্রিমাত্রিকতা রয়ে যায়। যেমন ছবি ও দর্শকের মধ্যে যে সংযোগ ও তজ্জনিত অনুভূতির নির্মাণ। দ্বিতীয়ত, ছবিটি নিয়ে পর্যালোচনার মাধ্যমে তার কিছুটা পুনর্নির্মাণ। চলচ্চিত্রের বিস্তৃত

শোলে ছবিতে সঞ্জীবকুমার এবং আমজাদ খান।

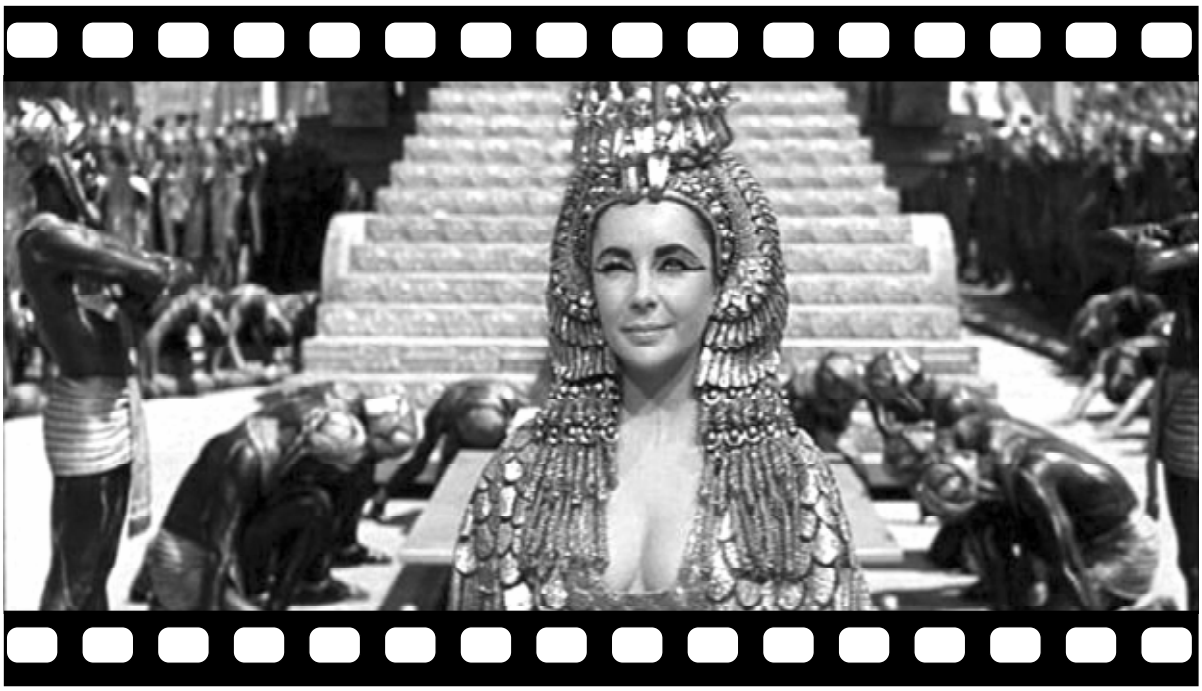

ক্লিওপেট্রা ছবিতে এলিজাবেথ টেলর।

দিগন্ত উন্মোচনে এর বিশ্বজননীতা অসীম। মানবিক আবেগ, বেদনা, ভালোবাসা, রোমান্টিকতা কী অনায়াসে দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে চলচ্চিত্র বাহিত হয়ে আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে তা আর চলচ্চিত্রপ্রেমীকে বলে দিতে হয় না। সে Mother India -তেও কাঁদে, Bycycle Thief এও কাঁদে, পথের পাঁচালীতেও ভেসে যায়।

দীর্ঘদিন অপসৃত হয়ে গেছে যে সময় সেই সময়ের ছবি আজ দেখলে অতীত সময়কালীন পরিবেশ, আবেগ, আচরণকে আমরা বর্তমান মানসিক স্তর থেকে বিচার করি, তাকে যেন ছুঁতে পারি। আজকের পরিবেশে অনেক কিছু হয়তো অবিশ্বাস্য মনে হয়। এখানেই একটি প্রশ্ন ওঠে অতীতের মূলত প্রধান ধারার যে হিন্দী ছবিগুলি সারা ভারতের দর্শককে (দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশ ছাড়া) মাতিয়ে রাখত, সেখানে কিছু উপাদান হয়তো আগে থেকে মজুত রাখা হতো। ন্যায়ের পথে চলতে গিয়ে বাবা বিপুল দারিদ্র্যে মারা গেলেন। মা কাজের লোক হয়ে ছেলে মেয়েদের বড় করলেন। তারা ভিলেনকে পরে চিনল। প্রতিশোধ নিল। পরিবারের সম্মান বাঁচানো বা 'ইয়ে শাদি নেহি হো সকতি' ইত্যাদি সংলাপ বারবার বলা বা আইনের হাত ভীষণ লম্বা' ইত্যাকার সাবধানবাণী যে আসবে তা যেন দর্শক জানত, সবই যেন নিয়তিনির্দষ্ট। তাই ঠিক সময়ে নাচে, গানে নাগাড়ে কান্না ও খোলামেলা প্রেমের দৃশ্য বা তীব্র ধ্বনিময় সংঘর্ষ ও মুষ্টিযুদ্ধ তারা চুটিয়ে উপভোগ করত। তারা যে বোকা ছিল তা ভাবা ভুল। বিখ্যাত কবি Collridge বলেছিলেন 'willful suspension of disbelief' ইচ্ছে করে অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাস করা। কিছুক্ষণ অবিশ্বাসের প্রবণতাকে স্থগিত করে রাখা। এটা হয়তো তারা জানত। হরলিক্সের বিজ্ঞাপনে যেমন সম্পূর্ণ পুষ্টির দাবি করা হয়। ৬০ থেকে ৮০-র দশকের মূল ধারার হিন্দি ছবি ছিল এই সম্পূর্ণ বিনোদন। অনেক চলচ্চিত্র বোদ্ধাই নাক সিঁটকে বলতেন Melodrama। কিন্তু মানুষ সম্পূর্ণ সচেতনভাবে এই মেলোড্রামাকে গ্রহণ করত। আসলে মানুষের জীবন ছিল অনেক জটিলতাহীন। তখন প্রতিদিনের আচরিত গড়পড়তা জীবন প্রণালীর থেকে অতিনাটকীয়তাই, অবদমিত ইচ্ছার পূর্ণতাই তারা উপভোগ করত। আজকের চলচ্চিত্র হয়তো অনেক বেশি বাস্তবের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কোথায় গেল গল্পের সেই বাঁক নেওয়া, ঘটনার আকস্মিকতা, কাকতালীয়ভাবে হারানো ভাইয়ের মিলন বা আবেগের উত্তুঙ্গ শিখর স্পর্শ করা। এমনও বলতে শোনা গেছে যে, প্রতিদিনের জীবন তো আমাদের সঙ্গী আমরা অতিকথন ভালোবাসি। জীবন একঘেয়ে, অতিকথন অনিশ্চয়তা ভরা। Glorious uncertainity of life হয়তো তারা বোঝাতে চাইত।

জটিলতাহীনতার যে উল্লেখ অতীত জীবন প্রসঙ্গে এসেছিল সেখানে কিন্তু আমরা চলচ্চিত্রের দর্শক হওয়ার আগে আজকের মতো কখনই এত ছানবিন করতাম না। এত রেটিং, সমালোচকের পছন্দ, সোশ্যাল মিডিয়ার অভিমত, এত কানাকানি ছিল না। অতীতের সিনেমা দেখতে যাওয়া ছিল বাস্তবে এক অবিমিশ্র আনন্দের হাতছানি। সেখানে চলচ্চিত্রের গুণমান মর্যাদা অত কঠিন মানদণ্ডে আগেভাগেই বিচার্য ছিল না। তাই আজকের সিনেমা বহু

ক্ষেত্রেই হয়তো অত্যন্ত চিন্তাপ্রসূত বিনোদন, কিন্তু তার নিজস্ব ম্যাজিকটি অজান্তেই অপহৃত হয়ে গেছে। অতীত চলচ্চিত্রের নির্মাতারা দর্শককে তাদের ছবির অংশীদার করে নেওয়ার চেষ্টা করতেন। চলচ্চিত্রীয় আবেগ যাতে সঠিকভাবে সঞ্চারিত হয়ে দর্শককে একাত্ম করতে পারে তার আয়োজনে কোনও ত্রুটি থাকত না। তাঁরা বুঝিয়ে দিতেন এটি চলতি জীবন নয়, কিছু একটা বিবৃত করা হচ্ছে। সেখানে অতি অভিনয় থাকতে পারে। অভিনেতা একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতেন। একে অনেকে যাত্রা বলে ঠাট্টা করতেন। কিন্তু এই উপলব্ধি বা চুলচেরা বিচারের দায় তন্নিষ্ঠ দর্শকের ছিল না। সে তো সাংস্কৃতিক বোদ্ধার ভূমিকায় নামেনি। বাস্তবে এই বোদ্ধাশ্রেণী কখনওই নিজের সামাজিক অবস্থান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কোনও সাদামাটা আবেগমথিত হাসি কান্নায় ভরা চলচ্চিত্রের সঙ্গী হতে পারেনি। তারা হয় নিজেদের আমিত্বকে সরিয়ে সিনেমায় আসতে ব্যর্থ হতো নয়তো তা উদ্দেশপ্রণোদিতভাবেই চাইত না। ছবির বাস্তব অনুষঙ্গ বা দৃশ্যের ওপর তারা এতই গুরুত্ব দিত যে ছবির অন্তর্নিহিত বক্তব্য যা মেলোড্রামা বা অতিনাটকীয়তার ক্ষেত্রে মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তারই বাহক ও অত্যন্ত প্রাচীন তা তাদের উপলব্ধির বাইরে থেকে যেত। এই অবহেলিত দর্শকরাই ভরিয়ে তুলতেন এক পর্দার চলচ্চিত্রালয়গুলি। সেখানেই বন্দি হয়ে আছে অগণন দর্শকের চলচ্চিত্র কুশীলবদের চাওয়া-পাওয়া, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গের সঙ্গী হয়ে নিজেকে হেলায় হারিয়ে ফেলার অকথিত কাহিনি। তাঁরা দৈনন্দিনতাকে এড়িয়ে সিনেমার হাতে নিজেদের নিশ্চিন্তে সঁপে দিয়েছিলেন। আজকের আমরা অনেক বেশি জানি। আর যত কিছু জেনে ফেলেছি তাকে তো আর ভুলে যেতেও পারি না, তাই সিনেমা এখন আমাদের অধীনে। অতীতের সিনেমা তার দর্শককে পুরোপুরি অধিকার করে নিত। দর্শকের তাতে কোনও আপশোষ ছিল না। সে যৌথভাবে চলচ্চিত্রীয় নৌকার যাত্রী হয়ে যেত। এখনকার আমরা নির্মোহ দর্শক।

অমিতাভ বচ্চন একটি চলচ্চিত্র উৎসবে একবার বলেছিলেন, ‘একটি অন্ধকার পরিসরে এক বিরাট সংখ্যক মানুষ কেউ কাউকে না চিনে পাশাপাশি বসে পর্দায় প্রক্ষিপ্ত একই সুখ-দুঃখের শরিক হয়ে কখনও হাসছেন কখনও কাঁদছেন এই কাজ সফলভাবে করার ক্ষমতা চলচ্চিত্র ছাড়া অন্য কোনও শিল্পমাধ্যমেরই নেই।’

প্রজেক্টর ডিভিডি-কে জায়গা করে দিয়ে হারিয়ে গেলেও ঐ ডিভিডিতেই কিন্তু ধরা পড়ে আছে সেই বিস্মৃত সময়। আজকে প্রথমে অভিভাবকের হাত ধরে দেখা, পরে বন্ধুদের সঙ্গে নির্ভেজাল আনন্দে উপভোগ করা বা প্রথম প্রেমিকার সান্নিধ্য পাওয়ার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বা পরে অর্ধাঙ্গিনীর সঙ্গসুখে উপভোগ করা চলচ্চিত্রগুলির আবারও মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ রয়েছে। সুযোগ রয়েছে ফিরে দেখার। এটি নোবেল বিজয়ী মার্কেসের প্রিয়তম বিষয় Reliving the lost day's এরই আর এক নাম। কত যুগ আগে দেখা চলচ্চিত্রগুলির পুনর্দর্শনে অনর্গল হয়ে যাবে স্মৃতির অবরুদ্ধ দরজা। সুযোগ থাকবে সেই সময়ে নিজের জীবন ও তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আত্মজ, সুহৃদ ও বয়োজ্যেষ্ঠদের যাপিত জীবনের অনুষঙ্গগুলিও নতুন করে স্মরণে আনার। কিন্তু থাকবে কি প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকার ঘেরা চার দেওয়াল আর যৌথ উপভোগের অনাবিল আনন্দ? না। এক একটি এক-পর্দার ছবিঘরের অবসৃত হওয়া তাই বাঙালির যৌথ স্মৃতির মৃত্যু। এই নিরুদ্দেশ সময়কে জীবনে আবার ক্ষণিকের অতিথি করতে মন তাই সক্রিয় হয়ে ওঠে।

শুরুতে উল্লিখিত কলকাতার বিশেষ বিনোদন ক্ষেত্র ধর্মতলা অঞ্চলের গরিষ্ঠাংশ সতীর্থের মৃত্যু-সাক্ষী নিউ এম্পায়ার, রক্সি, রিগ্যাল, প্যারাডাইস প্রেক্ষাগৃহ আন্তর্জাতিক নাম বহন করে এখনও রয়ে গেছে। ও তল্লাটে গেলে অতীতকে অন্তত একবার ছোঁয়ার অনুভব প্রবীণদের হবেই। রক্সি সিনেমার দিকে তাকালে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আপতকালীন সময়ে ‘হল’ কর্তৃপক্ষ আশ্রয় দিয়েছিলেন মিত্রশক্তির আমেরিকান সেনাদের। ১৯৪৩ সালে যুদ্ধের মধ্যগগনে অশোককুমার অভিনীতি ‘কিসমত’ এখানে চলেছিল ১০৮ সপ্তাহ। অবিশ্বাস্য লাগলেও সত্যি— দেখতে এসেছিলেন স্বয়ং নেতাজী। এসবই নথিভুক্ত আছে। একটু নজর কি দেওয়া যায় না? বিশ্বে এমন সংরক্ষণ-নজির ভুরি ভুরি। আমাদের মুম্বই তো পেরেছে তার অতীতকে ধরে রাখতে। আমরা পারি না?

শুভ দুর্গাপূজার প্রীতি

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

— জনৈক শুভানুধ্যায়ী

মশাল হাতে সিংহপুরুষ

জহর মুখোপাধ্যায়

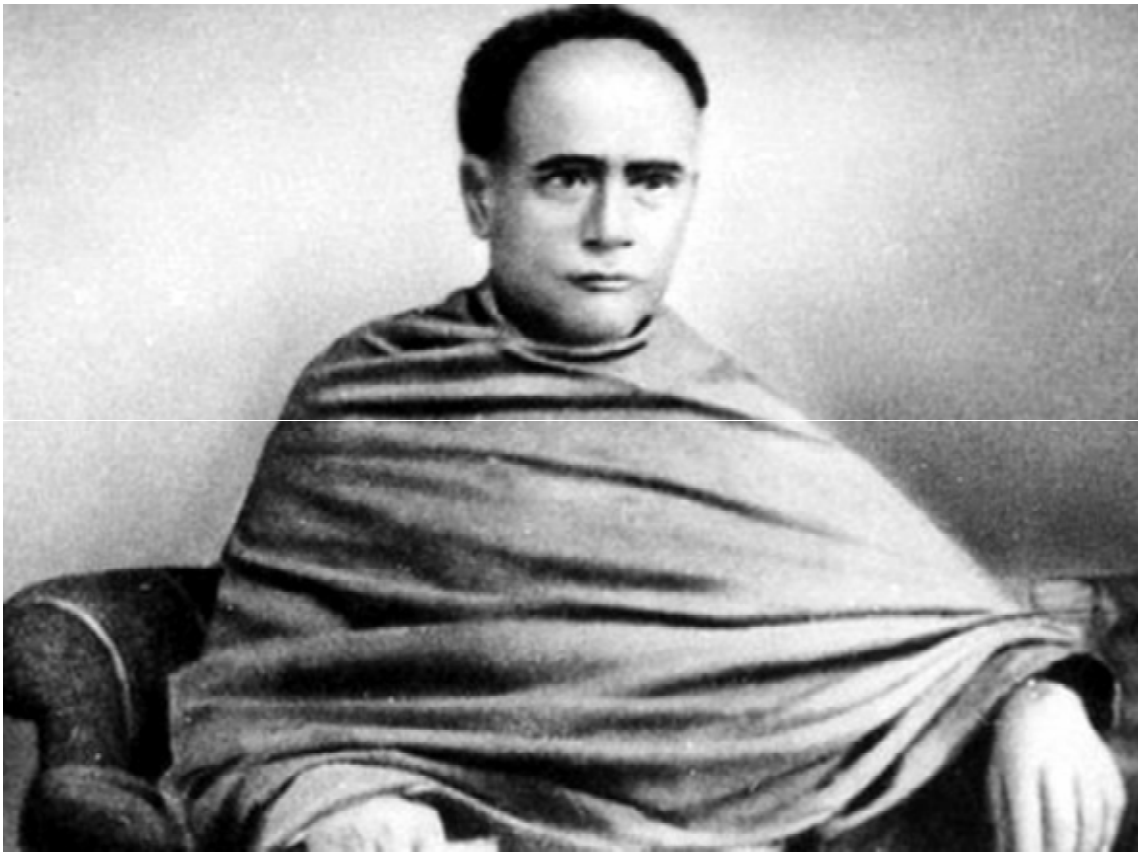

১২৭৯ সালের আষাঢ় মাস। ইংরেজি ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের জুন। কলকাতার উত্তরে একটি বাড়ি। সকাল থেকেই সানাইয়ের মিহি সুর বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। আজ যে বিদ্যাসাগরের মেয়ের বিয়ে। মধ্যম কন্যা কুমুদিনীর সঙ্গে চব্বিশ পরগনার রুদ্রপুর নিবাসী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিয়ে। ইনি মানভূম-পুরুলিয়ার সরকারি হৌসে সাব রেজিস্ট্রার। এক পরিবারের সঙ্গে আর এক পরিবারের মেয়ের বিয়ে দিয়ে আত্মীয় স্বজনের সীমা বৃদ্ধি করতে চাইলেও বিদ্যাসাগরের মনে শান্তি নেই।

পাঁচ সন্তানের মধ্যে নারায়ণচন্দ্র শুধু জ্যেষ্ঠ নয়, একমাত্র পুত্র। এত বড় আকাশে তারা একটি মাত্র ফুটলেও সূর্যের আলো এসে পড়েনি। অভিমানে ক্ষতবিক্ষত পিতা নানা কারণে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন। ভাবছেন, মায়ের তনয় মায়ের তো নয়। আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়ির একটি ঘরের জানালার সামনে বসে নিশুতি রাতে লিখে চলেছেন তাঁর ইচ্ছাপত্র বা উইল। চারিদিকে নিস্তব্ধ। ঘুমে অচৈতন্য চরাচর। শুধু জেগে আছেন বিদ্যাসাগর। একমাত্র পুত্রই শুধু তাকে আহত করেনি, সমাজে পুরনো ধ্যানধারণা, নিস্তরঙ্গ জীবনপ্রবাহে নতুন জোয়ার আনতে গিয়ে তাঁকে বারংবার বাধা দিয়েছে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ। বৈমাত্রেয়র মতো আচরণ করেছে ইংরেজ শাসক। মাটির সন্তানদের কাছ থেকে ছলে-বলে কৌশলে বশ্যতা আদায় করে আবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে করুণা। লোভী

জমিদার শ্রেণীর কিছু মোসাহেবি বাবু সম্প্রদায় ফুলেফেঁপে লাল না হলেও কুবেরের স্বপ্ন দেখেছেন। এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছিটেফোঁটা দয়াদাক্ষিণ্য কুড়োতে নেমেছেন তাঁর স্বজনেরাও। মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে, এর মধ্যে বিষয় সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারায় নেমেছেন তিনি। জীবন বীক্ষণে দৃষ্টিপাত করেছেন।

১৮৭৫ সালের ৩১ মে এই উইল অথবা ইচ্ছাপত্র রচনায় প্রবৃত্ত হলেন তিনি। বিশুদ্ধ মার্জিত বাঙলা ভাষায় রচিত উইলখানি দেখে কলকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব রেজিস্ট্রার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ চমৎকৃত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের লিপি কুশলতায় মনীষার দীপ্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। আপন পর নির্বিশেষে দীনদরিদ্র মানুষরা সাগরের মহৎ রূপ দর্শন করেছিলেন।

অর্থের তারতম্য বিচার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত এই উইল। সর্বোচ্চ টাকার অধিকারী ছিলেন পিতৃদেব ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই পিতৃদেবের সহোদর ভ্রাতৃগণ। এইভাবে পঁয়তাল্লিশজনকে নির্দিষ্ট হারে মাসোহারা দেবার নির্দেশ। এই উইলে মহামান্য আদালতের স্বীকৃতি পাওয়ার কিছুদিন আগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়িতে আবার বিয়ে। ১২৮২ সালের ৩০ আষাঢ় অথবা ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুলাই তৃতীয় কন্যা বিনোদিনী দেবীর সঙ্গে সূর্যকুমার অধিকারী গাঁটছড়া বাঁধলেন। নতুন জামাই বিএ পাশ। তার উপর শক্তপোক্ত গড়ন। জহুরির চোখে পড়লে যেমন হয়। শ্বশুর এবং জামাতা মণিকাঞ্চন বলে যাকে। পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে হৃদয়ের শত যোজন দূরে ঠেলে দিয়ে সূর্যবাবুকে পুত্রস্নেহে আরও বেশি করে ঢেলে দিলেন। উইলে সকলের জন্য বিগতিল ধারায় ব্যয়বরাদ্দ ঘোষণা হলেও শুধুমাত্র পঁচিশ নম্বর অনুচ্ছেদটি পড়ে একলাফে চোখ দুটি কপালে উঠে গেল নারায়ণচন্দ্রের। এ তো স্বর্গ থেকে পতন। পিতা-পুত্রের মাঝখানে এমন শক্ত প্রাচীর! পুত্রের কর্তব্যে ত্রুটি সংশোধিত হলো না বলে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন? বুকের ভিতরে প্রবল বেগে ঝড় বয়ে চলেছে। থামার লক্ষণ নেই। বিশ্বাস ভালোবাসা সন্তানের ওপর নির্ভরতা মূল্যবোধের খুঁটিগুলি একে একে মুখ থুবড়ে পড়েছে সেই ঝড়ে। বিদ্যাসাগর নিজের হাতে লিখে চলেছেন—

''আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী। এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণবশত আমি তাহার সংস্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি। এই হেতুবশত বৃত্তিনির্বন্ধস্থলে তাহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তিনি চতুর্বিশধারা নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধকালে বিদ্যমান থাকিলেও আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত অথবা এই বিনিয়োগপত্রের কার্যদর্শী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।''

এই উইল রচনার পরে বিদ্যাসাগর বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। অনুতাপে দগ্ধ হওয়া তো দূরের কথা, জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিতে একের পর এক দুঃখসংবাদ এসে ঘিরে ধরেছে। ১২৭৯ সালের ২৩ মাঘ বা ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি বারাণসী ধামে বিদ্যাসাগরের বড় জামাই গোপালচন্দ্র সমাজপতি কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি বিদ্যাসাগরের ভাগ্নে বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাশীতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসেছিলেন প্রাণহীন দেহ নিয়ে। জামাতার মৃত্যুসংবাদ তীরের মতো ছুটে এসে বিদ্যাসাগরের হৃদ্‌পিণ্ডে কোমল স্থানে এমন আঘাত হেনেছিল যে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। কিন্তু শোকাতুরা কন্যার সামনে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা জ্ঞাপন করতে গিয়ে নিজের বুকে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। জামাতা গোপালচন্দ্রকে সন্তানের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। বড় মেয়ে হেমলতার বৈধব্যবেশ দেখে বিদ্যাসাগরের বুক ফেটে যেত। কন্যার একাদশীর দিনে তিনি নিজেও অন্নজল গ্রহণ করতেন না। এমনকী দু-বেলার আহার পর্যন্ত দূরে ঠেলে দিয়ে কন্যার স্নেহে অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন। এই ভাবে একদিন কন্যার হাতে সংসারের সর্বময় দায়দায়িত্ব তুলে দিয়ে নীরবে অশ্রুপাতের সময়টুকু মুছে দিয়েছিলেন।

পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে বিসর্জনের বার্তায় বাড়ির অন্দরমহলে আগুনের মতো এক ঝলক গরম বাতাস ছড়িয়ে পড়েছিল। জননী দীনময়ী দারুণ মনস্তাপে ভেঙে পড়েছিলেন। পাঁচটি সন্তানকে কোলে পিঠে আগলে রেখে নিঃশব্দে স্বামীর সংসার সামলেছেন। যাঁরা কাছে ছিল কাছে থেকেও নিঃস্বার্থ ত্যাগ জানতে পারেনি কোনওদিনও। ঘর থেকে দু-পা ফেলে বাইরে এসে চোখ দুটি মেলে এই পৃথিবীর এত আলো দেখা হয়নি প্রাণভরে। সদা ব্যস্ত কর্মবীর তেজস্বী দানশীল মানুষটির সামনে দু-দণ্ড বসে মনের কথা উজাড় করে কখনো দিতে পারেননি। কিংবা দুজনায় দুজনেতে মগ্ন হয়ে প্রাণের বীণায় দ্বৈত সংগীতের মীড় খুঁজে পাননি। এমনকী দীনময়ীর প্রতি বিদ্যাসাগরের অমনোযোগিতা কিংবা চেনাজানার পরিসরটুকু ঘরের আড়াল ভেঙে যেতে পারেনি ঘরের বাইরে। পর্দার আড়ালে বড় একা হয়ে নিজের কথা নিজেই শুধু ভেবেছেন। দিন নেই, রাত নেই, এলেমেলো চিন্তারও শেষ নেই। এইভাবে অন্তঃপুরে অন্তরীণ থেকে ব্যর্থতায় হতাশায় ভেঙে পড়েছেন প্রতিমুহূর্তে। ১২৯৫ সালের ৩০ শ্রাবণ বা ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ আগস্ট মৃত্যুর কিছুদিন আগে জীবনের বোঝা লাঘব করার উদ্দেশ্যে দীনময়ী কপালে করাঘাত করতে শুরু করেন। বড় মেয়ে হেমলতা ছুটে এসে বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, মা কী বলিতেছেন শুনুন। কপালে করাঘাত আর কিছু নয়, পুত্রের জন্য শুধুমাত্র গর্ভধরিণীর করুণা ভিক্ষা। মৃত্যুদুয়ারে দাঁড়িয়ে দয়িতের সামনে শেষ আর্জি। সেদিন আশ্বাস পেয়ে সতী হাসি মুখে জীবনের কাছে বিদায় জানিয়ে গেলেন।

অস্তাচলের পানে চেয়ে এইভাবে ষোলটি বছর। শেষমুহূর্ত

পর্যন্ত উইলে একটি শব্দ পরিবর্তন করেননি বিদ্যাসাগর। বরং তাঁর উল্টোদিকের ছবিটা পরিষ্কার দেখা যায়। উইলের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ধন-সম্পত্তির সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ, এর জন্য তিনি লিখে যান স্পষ্টভাষায়— 'আমি স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে আমার সম্পত্তির অন্তিম বিনিয়োগ করিতেছি। এই বিনিয়োগ দ্বারা আমার কৃতবান সমস্ত বিনিয়োগ নিরস্ত হইল। চৌগাছানিবাসী শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ, পথিরানিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনাথ সিংহ, আমার ভাগিনেয় পসপুর নিবাসী শ্রীযুত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়— এই তিনজনকে আমার অন্তিম বিনিয়োগপত্রের কার্যদর্শী নিযুক্ত করিলাম। তাহারা এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী যাবতীয় কার্যনির্বাহ করিবেন। আমি অবিদ্যমান হইলে আমার সমস্ত সম্পত্তি নিযুক্ত কার্যদর্শীদিগের হস্তে যাইবেক। এক্ষণে আমার যে সকল সম্পত্তি আছে, কার্যদর্শীদিগের অবগতির নিমিত্তে তৎসমুদয়ের বিবৃতি এই বিনিয়োগপত্রের সহিত গ্রথিত হইল।

বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতী দেবী।

— (স্বাক্ষর) শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ সাল। ইংরেজি ৩০ মে, ১৮৭৫।

এখানে বলা আবশ্যক, নারায়ণবাবু প্রকৃতপক্ষে পিতার বিষয়-সম্পত্তি থেকে একেবারে বঞ্চিত হতে পারেন কিনা, সেই লক্ষ টাকার প্রশ্নের মীমাংসা হবে কিনা, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে নারায়ণচন্দ্র আদালতের আঙিনায় এসে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। পাল্লা ভারী ছিল বর্তমানের দিকে। শেষ রায়ে বিজয়ের হাসি নারায়ণচন্দ্রের মুখে শোভা পেলেও সিংহহীন গুহার সামনে দাঁড়িয়ে কেশর দুলিয়ে গর্জন শুনতে পেলেন স্মৃতির সরণী থেকে। মানুষটি যে আর কেউ নয়, বিদ্যাসাগর। স্মরণে বরণে শিরোপায় পিতৃসত্য। রামায়ণ-মহাভারতের দেশ ভারতবর্ষ। পিতৃপুরুষের পরম্পরা বয়ে চলেছে বংশধারায়। তাদের মহৎ দৃষ্টান্তগুলি পরবর্তী বংশধারায় ভালোমন্দের উপর দিয়ে আলোকপাত করে চলেছে। বাড়ির কর্তার চোখের সামনে থেকে শত যোজন দূরে গেলেও ছেলের মনের গহীনে তাঁরই ছায়াপাত হয়ে চলেছে। তাঁরই একাগ্রতা, দৃঢ়তা, মেধা এবং অপার করুণা পাখির চোখ মনে করে এগিয়ে চলেছেন নারায়ণচন্দ্র। নিজের চেষ্টায় সাব রেজিস্ট্রারের চাকরি জুটিয়ে নিলেন। কাজে যোগদান করেও বীরসিংহের গ্রামের বাড়িতে যেতেন। আবার মাঝেমধ্যে কলকাতায় বাবার কাছে। দিনকয়েক থেকে আবার গ্রামের বাড়িতে। বাবার কাছে থেকেও পিতা-পুত্রের বাক্যালাপ হতো না। শুধু অনুভবে জড়িয়ে থাকতেন। শোণিতে শোণিতে বার্তা বয়ে চলেছে যেখানে, সেই স্বাভাবিক মমতা অথবা অপত্য বড় সহজ পদার্থ নয়। কর্তব্য অনুরোধে ছেলেকে বিসর্জন দিলেও উইলের লেখাগুলি পার হয়ে বারেবারে সে ডেকে চলেছে হৃদয়ে লুকিয়ে থেকে।

এত যে ভীষণ তাঁর মধ্যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতো এক অনাবিল আনন্দের ঘটনা। সত্তর বছর জীবন সফরে বিদ্যাসাগরের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বিধবা বিবাহ। খ্যাতি অখ্যাতি যত হোক, যা হোক তা হোক, ঝড়ঝাপটা অনেক এসেছে ধেয়ে, তার মধ্যে সংকল্পের জ্বলন্ত প্রদীপটাকে দু-হাতে আড়াল দিয়ে আগলে রেখেছেন। এমনকী নিজের একমাত্র ছেলে নারায়ণচন্দ্রকে এক বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে মাইল ফলক তৈরি করেছেন।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নবদিগন্তের আলোর স্বপ্নে যাত্রা শুরুতে থমকে গেলেন। বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একজন ছেলেবেলার সহচরী ছিল। সেই সহচরী কোনও প্রতিবেশীর কন্যা। বিদ্যাসাগর মেয়েটিকে বড় ভালোবাসতেন। বালিকাটির বিদ্যাসাগরের বাড়িতে সর্বদা যাতায়াত ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় ঠাকুরদাসের হাত ধরে যেদিন কলকাতায় পড়তে আসেন, ইত্যবসরে বালিকার বিয়ে হয়ে যায়। খেলাঘর ভেঙে শ্বশুর বাড়ি। স্বামীর ঘরসংসার। তার সরল অপরিণত নরম মনের উপরে মস্ত এক পাথর চাপা দিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠানো হলো। বিয়ের কয়েক মাস পরে মেয়েটির সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল। সে এখন একা। সংসার দরিয়ায় ভাসমান খড়কুটোর মতো দিশাহীন। বৈধব্য সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো যথাস্থানে। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে এলেন। প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে গিয়ে কুশল খবর সংগ্রহ তাঁর স্বভাব ছিল। এবার তার বাল্যসহচরীর ঘরে প্রবেশ করতেই শুনতে পেল সারাদিন নিরন্ন উপবাস। সেদিন যে একাদশী। শূন্য সিঁথির মধ্যে স্বামী লুকিয়ে থাকেন। তাঁর কথা ভেবে সর্বস্ব কৃচ্ছ্রসাধন। সেদিন কেন যে মেঘ উড়ে এসে ঢেকে দিল

বিদ্যাসাগরের হৃদয় আকাশে। দরবিগলিত চোখে দু-হাত চাপা দিলেন। মনে মনে স্থির করলেন এর একটা বিহিত নিশ্চয়ই করবেন। যত ঝড় উঠুক, বিঘ্ন বাধা আসুক, নীড় ভাঙা আহত এক প্রাণের পাখিদের ঠাঁই দেখাবেন। সেদিন এমন কী আর বয়সে। জীবনপদ্মের কুঁড়ি সম্পূর্ণ প্রস্ফূটিত হয়নি। তবু এক দুর্বার তেজস্বী কিশোরের দুটি চোখ জ্বলে উঠেছিল আধুনিক ভারতবর্ষের স্বপ্নে। জাতীয় সত্তার অনুভবে।

পিতা-মাতার প্রতি তাঁর ভক্তি এবং বিশ্বাস ছিল অগাধ। বলতে গেলে বুকের দুই পাশে দুই হৃদপিণ্ডে স্থান ছিল দুজনের। সেখানে থেকেও বিদ্যাসাগরের মনের আকাশে মেঘ উজাড় করে দিয়েছে ওরা। ভাবীকালের দিকে চেয়ে সঠিক দূরদৃষ্টি ছিল না ঠাকুরদাসের। নারায়ণচন্দ্র লেখাপড়ায় আগ্রহী ছিলেন না। পাঠশালায় ছাত্রবৃত্তির আগেই তাঁর বিদ্যাযাত্রা স্তব্ধ হয়ে যায়। ঈশ্বরচন্দ্রের দু-ভাই হরচন্দ্র আর হরিশচন্দ্র নিয়তির খোরাক হয়ে কলেরায় মারা যান। পুত্রশোকে কাতর ঠাকুরদাস ছেলের পরমায়ু ছিল না বলে মনকে সান্ত্বনা দিলেও কলকাতায় থেকে ভালো ডাক্তারের অভাব একবারও স্বীকার করলেন না। দেশটা যে সেই মান্ধাতার আমলের ধ্যানধারণায় আটকে রয়েছে বিন্দুমাত্র বুঝতে পারলেন না। দু-দুটো ছেলে কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ফোটার আগে ঝরে গেলেও সম্যক উপলব্ধি হলো না ঠাকুরদাসের। অন্ধ আবেগবশত তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। বললেন, নাতিটাকে আর কখনও কলকাতায় পাঠাবেন না। কলকাতায় গেলে যমরাজের রান্নাঘরে ঢুকে যাবে। প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। এমনকী ছেলে ঈশানচন্দ্রকেও বাধা দিলেন। বিদ্যাসাগরের স্ত্রী দীনময়ী দেবীও গ্রামে মাটির ঘরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নির্নিমেষে চেয়ে থাকতেন একান্ত মানুষটির জন্য।

ঠাকুরদাসের সামনে দাঁড়িয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করেও ভ্রান্ত ধারণার প্রাচীর ভাঙতে পারলেন না। যাকে বলে একরোখা গোঁ। হতাশ বিদ্যাসাগর। নিজের বাড়ি থেকেই সরস্বতীর আসন গুটিয়ে নিলে পরিণামে ভালো হবে না। নারায়ণের বয়স যখন ষোলকলা পূর্ণ হলো বাগদেবী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে দিন থেকে। ফলে পড়াশুনায় 'ন যযৌঃ ন তস্থৌঃ' অবস্থা। গ্রামের পাঠশালা পার হতে নারায়ণ পারল না। পিতামহের অন্ধ স্নেহে এবং মাত্রাতিরিক্ত আবেগে নারায়ণ যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছে না, এ যাতনা বিদ্যাসাগর সহ্য করতে পারছেন না। আহত পাখির মতো নিজের কাছে ডানা ঝাপটে মরলেও কেউ বুঝল না। জানল না, কী যে মনের ব্যথা। অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকা আপনজনদের ঘুম ভাঙল না। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলি থেকে আলো এসে পৌঁছতে পারল না গ্রামবাংলার মানুষের চোখে। কিন্তু বিদ্যাসাগর যে আলাদা মানুষ। যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়েও ময়দান ছেড়ে যাবার পাত্র নন। সময় বুঝে একদিন নারায়ণকে ঠাকুমা ঠাকুরদার কবল থেকে হাইজ্যাক করে কলকাতায় নিয়ে এলেন। সোজা এসে ঢুকলেন সারস্বত আঙ্গিনায়। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে বিদ্যালয় বিভাগে ভর্তি করে দিলেন নারায়ণচন্দ্রকে। বীণাপানির চরণ ছুঁয়ে বিদ্যাযাত্রা আরম্ভ হলেও কিছু দূরে গিয়ে যাত্রাভঙ্গ করলেন নারায়ণচন্দ্র নিজে, অস্থির হয়ে। বছর না ঘুরতে পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়ে উঠলেন নারায়ণচন্দ্র। কিন্তু বাবা যে অতন্দ্র প্রহরীর মতো হলেও মনোবিহঙ্গের পায়ে বেড়ি দেবেন কীভাবে। নারায়ণচন্দ্র একদিন পালিয়ে গেলেন সেই গ্রামের বাড়িতে।

নারায়ণচন্দ্র পড়াশুনায় ইতি টানলেও বাংলাদেশের নরনারায়ণের সামনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর আরও বড় এক রণাঙ্গনে দাঁড়ালেন এসে। কলকাতায় মেট্রোপলিটান স্কুল এক মহৎ কীর্তি বিদ্যাসাগরের। মশাল হাতে নিয়ে অন্ধকার ছিঁড়ে ফেড়ে এগিয়ে যেতে উদ্যত হলেন।

ইতিহাস রচনায়ও উপকরণ থাকে। যে কোনও মহৎ সৃষ্টির উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে অনেক অজানা তথ্য জানা যায়। ১২৭১ সালে অথবা ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের কিছুদিন আগে কতিপয় বঙ্গসন্তানের উদ্যোগে গড়ে ওঠে এক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট। এর উদ্দেশ্য হাতে-কলমে কাজ শিক্ষা করে যুবকদের আত্মনির্ভর করা। কিন্তু সূচনাতেই নানা মুনির মত পার্থক্যে ট্রেনিং স্কুল মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ইঁট-কাঠ-বাঁশের বেড়ার বেহাল চিতাভস্মের উপর দিয়ে বিদ্যাসাগরের বিজয় কেতন মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশনের জন্ম হয়।

শৈশবে কার না হাবাগোবা অবস্থা থাকে। ছোট্ট একটা বিজের মধ্যেই তো মহীরূহ ঘুমিয়ে থাকে। মেট্রোপলিটন স্কুলও সেদিন আঁতুড় ঘর ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভার একা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে এসে পড়ে। এজন্য তাঁকে অঢেল অর্থ এবং সামর্থ ঢেলে দিতে হয়েছিল। তাঁর উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ মানুষের ঢল কোথাও যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেই উদ্দেশে বিদ্যালয়ের মাইনে একেবারে উঁচু শ্রেণী থেকে নিম্নধাপ পর্যন্ত তিন টাকা নির্দিষ্ট হলেও কাঁচা পয়সা হাতে কোথায়? পাশাপাশি বিনা মাইনেতেও পড়াতে হতো। তা বলে কি পড়াশুনা অধ্যবসায় শিথিলতা, বরদাস্ত নয় একেবারে। নিজে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে শিক্ষা বাগিচায় যতটা নতুন নতুন ফুল ফোটানো যায়, একেবারে যারা অবুঝ, কিছু বোঝে না সেই কুঁড়িগুলিকে প্রস্ফূটিত করে নির্যাস বিলিয়ে দিলেন সমাজের অভ্যন্তরে। অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে বসে সারাক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে শুনতেন পড়ুয়াদের প্রাণের কলতান। পড়াশুনার সঙ্গে শৃঙ্খলা, পরস্পর সহমর্মিতা, সর্বোপরি দেশ এবং জাতির প্রতি আগ্রহ — এমন অনন্যপূর্ব শিক্ষা ব্যবস্থার গুণে মেট্রোপলিটন একটা সম্ভ্রান্ত

মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশন (মেন)

ইংরেজি বিদ্যালয় হিসাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যাসাগর ভগীরথের মতো আগে আগে যেতেন। অনেক বাধাবিঘ্নের প্রাচীর ভেঙে এগিয়ে যেতেন। বেথুন স্কুলের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ছিলেন। ১২৭১ সালের ১ চৈত্র অথবা ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান। বিদ্যার্থীদের সাফল্যের নিরিখে পারিতোষিক প্রদান। সভায় বড়লাট লরেন্স এবং তাঁর পত্নী অলংকৃত হয়ে বসেছিলেন, হঠাৎ সেখানে খর্বাকৃতি ধুতি চাদরে বিভূষিত এক ব্যক্তির প্রবেশ। শিক্ষার্থীরা উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকে সম্মান জানালেন। মানুষটি যে স্বয়ং বিদ্যাসাগর। অসংখ্য তারার মধ্যে কোনটা যে ধ্রুবতারা সভায় উপস্থিত সকলে ঠিক চিনতে পেরেছেন। বাবু কেশব সেন, বাবু এম এম ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সামনে বিদ্যাসাগর মেধাবী শিক্ষার্থিনী একজনের গলায় সোনার হার পরিয়ে দিয়ে লেখাপড়ায় উৎসাহ দান করেছিলেন।

সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে তিনি করুণায় বিগলিত হয়ে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। নারায়ণের প্রাণের দেবতার সেবায় পাশে কাউকে না দেখলেও ঝড়ের পাখিকে তিনি আগলে ধরতেন বুকের কাছে। ১২৭৩ সালে বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ ইংরেজি ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের মে-জুন, দেশব্যাপী এক দুর্ভিক্ষে আতঙ্কিত মানুষ। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া স্পর্শ করতে পারেনি ক্ষমতার অলিন্দে দণ্ডায়মান সাহেবদের। ঝড়ে যত বক মরে ফকিরের কেরামতি ততো বাড়ে। বিদেশি শাসকেরা সেই দুঃসময়ে উদাসীন থাকায় কত লোক অন্নাভাবে লতাপাতা কচুসেদ্ধ খেয়ে মৃত্যুর দুয়ারে এসে লুটিয়ে পড়ে আছে। ছেলে-মেয়েদের ফেলে রেখে কত মা জঠরজ্বালায় উন্মাদের মতো শহরের দিকে ছুটে চলেছে। পথে অনেকেই জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। মৃত্যুর মিছিল ধনী মানুষের বুকের পাথর ভাঙতে না পারলেও সমব্যথী মানুষ মাত্রেই চমকে উঠেছিলেন। হায় হায় করেছিলেন এত মানুষের মৃত্যু দেখে। প্রথমত বিদ্যাসাগর মহাশয় দারুণ এই দুর্ভিক্ষের খবর পেয়েছিলেন একটু দেরিতেই। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার একজন সংবাদদাতা কাতর কণ্ঠে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আবেদন করেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় এই দুঃসংবাদ গ্রাম থেকেও জানতে পারেন। করুণার প্রতিমূর্তি তখন কি আর স্থির থাকতে পারেন? নিরন্নের মুখে অন্ন তুলে দিতে বিভিন্ন স্থানে অন্নসত্রের ব্যবস্থা করলেন। বীরসিংহ গ্রামে ভগবতীদেবীর উদ্যোগে ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা। এইভাবে রোজ পাঁচ থেকে ছশো লোকের উদরপূর্তি। ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করে অভুক্ত মানুষজনকে অন্নদান। এমনকী দুঃসহ ভয়ে আতঙ্কে স্বামী সন্তান ফেলে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে যারা তাদের ফিরিয়ে এনে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব বহন করতেন বিদ্যাসাগর। আসন্ন সন্তানসম্ভবা নারীদেরও ব্যবস্থা করতেন। এ লড়াইয়ে তিনি পিছু হটতে জানতেন না। এমনকী এমন স্বপ্ন কখনও দেখতেন না যে এ লড়াইয়ে তিনি ময়দানে ধরাশায়ী হয়ে রয়েছেন। দাঁতে দাঁত চেপে মাথা তুলে আকাশের দিকে সগর্বে চেয়ে বলেছেন— এ লড়াই জিততে হবে। অন্নহীন মানুষের বুকের ভিতর থেকে আতঙ্কের মেঘ সরিয়ে দিতে হবে যে কোনও প্রকারে।

এত ব্যস্ততার মধ্যেও কলম থেমে নেই। সম্পূর্ণ নিজের

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে

SIP করুন, উন্নতি করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত
SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের
ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ১.০১ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ৪.৮ লাখ টাকা মাত্র।

মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

DRS INVESTMENT

Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond

কোলকাতা, হাওড়া • Email : drsinvestment@gmail.com

9830372090
9748978406

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

উদ্যোগে একটা প্রেস এবং বুক ডিপোজিটরি গড়ে তুলেছিলেন। যেখানে গেলে পাওয়া যাবে অরূপরতন। আলমারির তাকে তাকে বইয়ের তথ্য ভাণ্ডার। বিদ্যাসাগর যার নামকরণ করেছেন সংস্কৃত মুদ্রণ যন্ত্র। পাশাপাশি বিনিদ্র রজনী ধরে লিখে চলেছেন। কার্যোপলক্ষ্যে বর্ধমানে গিয়েও নীরবে নিভৃতে বসে লেখায় মগ্ন হয়ে পড়েছেন। সেক্সপিয়রের 'কমিডি অব এরারস্' অবলম্বনে ভ্রান্তিবিলাস লিখে ফেলেছেন। বিদেশি ভাব ও ভাষাকে তিনি কেমন করে বঙ্গীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত করেছেন। ফলে ভ্রান্তিবিলাস একখানি উচ্চাঙ্গের বাংলা উপন্যাস হিসেবে সমকালের আবেদনে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ। উত্তরচরিত ও অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটক দুটি প্রকাশ করেন। বই দুখানির সারাংশ লেখা হয়েছিল। বাংলা ভাষায় লেখা উপক্রমণিকাটুকু পাঠকের কাছে উপাদেয়। বিদ্যাসাগরের কলম থেকে মধুর কোমল বাক্য নির্যাস। এর পরও বিরাম নেই। শিশুপাল বধ, কাদম্বরী, কিরাতার্জুনীয়, রঘুবংশ, একের পর এক বই প্রকাশ করে সাহিত্য বাগিচায় নতুন নতুন কুঁড়ি ফুটিয়ে চলেছেন। যার নির্যাস মহাকালের কালিমা মুছে দিয়ে অমলিন হয়ে আছে এই সময়েও।

এইসব গ্রন্থের মুদ্রণ যন্ত্র বা সংস্কৃত বুক ডিপোজিটরি কেন্দ্রটি বিদ্যাসাগর গড়ে তুলেছিলেন অনেক স্বপ্ন নিয়ে। অনেক শ্রম-মূলধন এবং ঘাম নিংড়ে দিয়ে যে সংস্থানটি দাঁড়িয়েছিল একদিন সেখানেই ফাটল দেখা গেল। ১২৭৬ সালের ২৫ শ্রাবণ অথবা ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ আগস্ট বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজকৃষ্ণবাবুর কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এলেন। মাত্র চার হাজার টাকায় সংস্কৃত প্রেসের সিংহভাগ বিক্রি করে দেবেন। অবশিষ্ট অংশটাও কালীচরণ ঘোষকে একই মূল্যে দিয়ে দেবেন। এই ছাপাখানার খ্যাতি এবং শ্রীবৃদ্ধি মানুষের চোখের গভীরে লুকিয়ে থাকলেও বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনী শক্তিও যে প্রকাশিত হয়েছিল। অক্ষর যোজনার এমন সুবিধা তৈরি করে দিয়েছিলেন যার নাম হয়েছিল 'বিদ্যাসাগর সার্ট।'

রাজকৃষ্ণবাবুর মুখেই শোনা গেছে, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পাওনা টাকার জন্য পুনঃ পুনঃ তাগাদা দেওয়ার পরিণামে ছাপাখানার অংশ বিক্রি করে বিদ্যাসাগর আত্মসম্মান রক্ষা করেছিলেন। এইভাবে ঘরে এবং বাইরে অসংখ্য অজস্র মানুষের বারংবার আঘাতে নিঃশব্দে নীরবে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ যেভাবে শুরু হয়েছিল তার মধ্যে দিয়ে জীবনপদ্মের পাঁপড়িগুলিকে অসীম আলোর দিকে বিদ্যাসাগর মেলে ধরেছিলেন। অভিমানে ক্ষতবিক্ষত হয়েও চারত্রিক গুণাবলিকে রক্ষা করেছিলেন অরূপরতনের মতো।

অবিরত অপূর্ণ মানুষ। জীবনযুদ্ধে অতন্দ্র সাহসে জেগে থেকে চেয়ে দেখার মতো প্রক্রিয়ার অভাবে বহু মানুষ যে সমাজে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারছে না। এমনকী বাঙালি জাতিসত্তার প্রয়োজনে সামনে আসতে পারছে না এই অভিমানে বিদ্যাসাগরের অন্তরে গভীর অনুভব থেকে আগুনের ঝলক নিঃশব্দে উৎসারিত হয়ে উঠত।

ছেলে বিধবা বিয়ে করলেও এই বিধবা বিয়ে নিয়ে কত কাণ্ড। বিদ্যাসাগরের নিজের গ্রামেই অনুষ্ঠেয় একটি বিধবা মেয়ের বিয়ে তার মহানুভব এবং উদার ভাবধারায় দারুণ আঘাত হেনেছিল। ১৮৬৯ সাল। ক্ষীরপাই নিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামে কেঁচকাপুর বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত কাশীগঞ্জ গ্রামের মনোমোহিনী নামে অপরূপা এক ব্রাহ্মণ বিধবাকে বিয়ে করতে উদ্যোগী হলেন। সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। কিছুদিন আগে ঠাকুরদাস কাশী গিয়েছেন। বাবার অবর্তমানে বাড়ির কর্তা বলতে বড় ছেলেটি। মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষীরপাই গ্রামের হালদার পরিবারের ভিক্ষাপুত্র। হালদারবাবুরা বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করলেন, এ বিয়ে যাতে না হয়। সব কথা শুনে বিদ্যাসাগর তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, এ বিয়ে কোনওভাবেই হবে না। নিজে বিধবা বিবাহের ভগীরথ হয়েও কেন যে বাধা দিতে সম্মত হলেন এ রহস্য জানা যায় না। মনোমোহিনী এবং তাঁর মাকে নিজেদের গ্রামে ফিরে যেতে বললেন বিদ্যাসাগর।

সেদিন বর্ষাকাল। মেঘমন্দ্রিত আকাশে একেবেঁকে বিজুরি ছুটছে। চমকে উঠছে মানুষ ভয়ে অসলতায় দরজা বন্ধ করে ঘুমে অচেতন হয়েছে গৃহবাসী। কিন্তু নিশুতি রাতে বিদ্যাসাগরের ঘুম ভেঙে গেল। কান পেতে শুনলেন প্রতিবেশী কারও বাড়ি থেকে শঙ্খ আর উলুধ্বনি ভেসে আসছে। বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে মেয়েদের তাজা ফুসফুসের হাসি আর কররোল শোনা যাচ্ছে। ভোর না হতে প্রতিবেশী গোপীনাথ সিংহের মুখে শুনলেন মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় আর মনোমোহিনীর চার হাত এক হয়ে গেছে।

এ ঘটনা রূপকথার মতো শোনালেও বিদ্যাসাগর মহাশয় আরও জানতে পারলেন এর নেপথ্যে ঘুঁটি সাজিয়েছেন মধ্যমভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন এবং পুত্র নারায়ণচন্দ্র। এমনকী মা ভগবতী দেবী এবং দীনময়ী দেবীও যে এই ঘটনা চাটনির মতো মধুরেন সমাপয়েৎ করেছিলেন— সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন তিনি।

পরদিন ভোর হলো। বিদ্যাসাগর সবাইকে ডেকে বললেন, নিদ্রিত আছ যারা জেগে ওঠো। আমার কথা শোনো। আমি বীরসিংহ গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। মনপাখি উড়াল দিয়েছে। আর হেথা নয়। কথা দিয়েও কথা রাখতে পারলাম না আমি। এ লজ্জা শুধু আমার। মনোবেদনার কেউ নেই। ফিরব না। ফিরে আসবো না কোনওদিন।

বিদ্যাসাগর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। পরনে আটহাতি

ধুতি। গায়ে আড়াআড়ি ভাঁজ করা চাদর। পায়ে চটি। দুহাতে দুটি ব্যাগ। লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে চলেছেন। পিছু পিছু মা-ভাই-স্ত্রী গ্রামবাসী অনেকেই। কারও কথা শুনলেন না। জননী এবং জন্মভূমি সবথেকে প্রিয় বিদ্যাসাগরের কাছে। গ্রামের স্কুল বাড়ি ঘরে তিনি কোথায় নেই। সব কিছু পিছে রেখে তিনি এগিয়ে গেলেন। শুধু স্মৃতিটাই চলার পথে সঙ্গী হয়ে রইল। এ ঘটনার পরেও বাইশ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। গ্রামে ফিরে আসনেনি। সামনে আরও বড় কর্মক্ষেত্র। অন্বেষার দৌড় শুরু করেছেন। রেসের ঘোড়া কোনোদিন পেছনের দিকে চেয়ে দেখে না। অপস্রিয়মাণ পথ মুখ লুকায় পায়ের নীচে দিয়ে। টগবগে গতিপথই যার প্রাণশক্তি।

কলকাতায় ফিরে এসে বিদ্যাসাগর একটি খবর পেলেন। ছেলে উপযুক্ত হলে ঘর এবং ঘরনি প্রয়োজন হয় দুটোরই। ১২৭৭ সালের ২৭ শ্রাবণ অথবা ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ১১ আগস্ট বৃহস্পতিবার, পুত্র নারায়ণবাবু বিধবা বিবাহ করেন। পাত্রী শ্রীমতী ভবসুন্দরী। বাবার নাম শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নিবাস কৃষ্ণনগর। বয়স তেরো বছর। কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ফোটার আগেই বর্ণ-গন্ধ স্বাদে অনাঘ্রাত মেয়েটি বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছে বিধবা হয়ে। খবর শুনে নারায়ণবাবু স্বয়ং উপস্থিত পাণিপ্রার্থী হয়ে। এই বিয়ের আগে নারায়ণবাবু বাবাকে এইভাবে বলেছেন— 'আমার এমন কোনও গুণ নাই যে আপনার মুখ উজ্জ্বল করিব, তবে আপনার জীবনের মহৎ ব্রত বালবিধবা বিবাহ প্রচলন করিয়া বালবিধবার ভীষণ বৈধব্যযন্ত্রণা দূর করা। এ অধম সন্তানের তাহা অবশ্য সাধ্যায়ত্ত। আমি তাহাতে পশ্চাৎপদ হইব না। তাহাতে আপনাকে কতকটা সন্তুষ্ট করিতে পারিলে আমার জীবন ধন্য হইবে, আর তাহা হইলে বোধহয় আপনার সদর্ভিপ্রায়ের বিপক্ষবাদীরাও সন্দিহান হইতে পারিব না।'

মেয়েটির মা মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে বীরসিংহ গ্রামে উপস্থিত। সেদিন ভোরের বেলা। ভবসুন্দরীর মুখে ভোরের প্রথম আলো দেখে সেই যে নারায়ণের চোখের গভীরে ডুবে গিয়েছিলেন উঠতে পারলেন না আর। নারায়ণবাবুর পিতৃব্য বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সামনে পুনর্বিবাহ দেবার প্রস্তাব পাড়েন। কন্যাদায়গ্রস্ত মেয়েটির মায়ের চোখের জলের কথা না ভেবে ভোরের আলোর কথা ভেবে নারায়ণবাবু বিয়ে করতে রাজি হলেন। একটি বিধবা মেয়েকে নিয়ে এমন স্বপ্ন আগে কখনও দেখেনি পাত্র নিজেও। খবরটা বিদ্যাসাগরের কাছে যেতেই কোনও বিরূপ লক্ষণ প্রকাশ পেল না। বরং বাড়ির আর সবাই অন্যমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু ততক্ষণে মন দেওয়া-নেওয়ার পর্ব শেষ হয়েছে। বরং খুশি হয়ে বিদ্যাসাগর ছেলে এবং বৌমাকে কলকাতায় এনে ঘটা করে বিয়ে দিতে চাইলেন। মৃজাপুর নিবাসী ডিভিসনাল কালেক্টর কালীচরণ ঘোষের বাড়িতে এই শুভ বিবাহ সম্পন্ন হলো। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এ এক বিচিত্র ঘটনা। দু-পায়ে আলতা রাঙা, কপালে সদ্য এয়োতির জ্বলজ্বলে আবেদন। বেনারসীর আচ্ছাদনে মোড়া সলজ্জা ভবসুন্দরী শ্বশুরবাড়িতে এলে তেমন সাড়া পড়ল না। কেউ উলুধ্বনি দিয়ে নববধূর পথ নব আনন্দে ভরিয়ে দিলেন না। কেউ বাজায়নি শাঁখ। নারায়ণের মা-ঠাকুমা কাকা সরে গেছেন অনুষ্ঠান থেকে। শুধুমাত্র তারানাথ তর্কবাচস্পতির স্ত্রী নববধূকে বরণ করে ঘরে তুললেন। বিদ্যাসাগর আনন্দ পেলেন। বিধবা বিবাহ নিয়ে যে বৃহৎ রণাঙ্গনে পা রেখে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন পাশে সহযোদ্ধা নারায়ণকে দেখে খুশি হলেন। অথচ তখনও তিনি জানতেন না এই একমাত্র ছেলেকেই দু-চোখের সীমানা থেকে দূরে ঠেলে দিতে বাধ্য হবেন।

যারা কাছে ছিল তারা চলে গেলে সংসারে প্রধান মানুষটিও কি শান্তিতে দিনপাত করতে পারেন? মাত্র কিছুদিন আগে শিক্ষা বিভাগের কেষ্ট-বিষ্টুদের বিরুদ্ধে নিজের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। ১২৬৪ সালে অথবা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় হেলিডে সাহেবের আদেশে অনেক জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় তৈরি করেন। হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার স্কুল ইন্সপেক্টর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে গ্রামগুলিতে লেখাপড়া শিক্ষায় বিশেষভাবে দৃষ্টি দিলেন। বাঙালি সমাজের গভীরে ঘুরঘুটে অন্ধকারে শিক্ষা এবং জীবনযাপনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো উদার হাতে ঢেলে দিতে চেয়েছেন। ঠিক তখনই অনিবার্য সংঘাত। বীরসিংহের সিংহপুরুষটি কেশর দুলিয়ে জেগে উঠেছেন স্ব-বিক্রমে। আত্মবিশ্বাস এবং চেতনায় টইটম্বুর হয়ে তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেবের বিরুদ্ধে ছোটলাট বাহাদুরের কাছে অভিযোগের প্রমাণপত্র দাখিল করেন। কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থাপনার শীর্ষে নৈবেদ্যের মাথায় আতার টুকরোর মতো বসে অআছেন যিনি বৈমাত্রেয় আচরণে সিদ্ধ। তিনি কৌশলে শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তার সঙ্গে সহযোগিতা এবং সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে বিদ্যাসাগরকে কাজ করার পরামর্শ দিলেন। স্বজাতি এবং শাসনের প্রয়োজনে সাহেবদের অসাধ্য এমন কোনও কাজ নেই। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় স্বয়ং ছোটলাট সাহেবও যে জল ঢেলে দিলেন বুঝতে পেরে রাগে দুঃখে অভিমানে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল এবং স্কুল দপ্তরের ইন্সপেক্টর পদ ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপ দিলেন এক অনিশ্চিত উত্তাল জীবন দরিয়ায়। যশ, অর্থ প্রতিষ্ঠার বৃহৎ সিংহাসন থেকে নেমে এসে মিশে গেলেন হাহাকার দীর্ণ দুঃখ, দুর্দশা সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে। আরও বড় লড়াইয়ের জমিতে পা রেখে চেয়ে দেখলেন আকাশের দিকে। বস্তুত ফাঁকা বন্ধুর ময়দানের উপর দিয়ে শীতল হাওয়া দৌড়ে এসে, মেঘ উড়ে এসে বিদ্যাসাগরের জীবনের বিষণ্ণ কাহিনি লেখা হলো সেদিন থেকেই।

১২৭৬ সালের ১০ ফাল্গুন অথবা ১৮৭০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি, রবিবার। বেলা তিনটেয় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো

ঘটনা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন থেকে বিদায় নিলেন। যে বন্ধুর কাছে বিদ্যাসাগর মহাশয় তোতাপাখির মতো ইংরেজি শিখেছেন, পরে পারদর্শিতা লাভ করেছেন। শতগুণে বিকশিত দুর্গাচরণ, চরণচিহ্ন এঁকে রেখেছেন সমাজের অগণন মানুষের কাছে। তাঁর উদার হৃদয়ের নির্যাসে আপ্লুত হয়ে কখন যে চিকিৎসা বিদ্যাতেও বিদ্যাসাগর পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন, শত শত আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন দু-হাত বাড়িয়ে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায় চলে গেলেন। ১২৭৭ সালে বিদ্যাসাগরের আর এক পরম অকৃত্রিম সুহৃদ, বর্ধমানের মহারাজ প্রতাপচন্দ্র লোকচক্ষুর আড়ালে অন্তর্হিত হলেন। একে একে নিভেছে দেউটি। আর এক বিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বাঙালি জাতির সামনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের জন্য জীবনপাত করে চলেছেন। বিদ্যাসাগর স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে হাজার টাকা দিলেন। বাঙালি সমাজে সভা সমিতিতে দান করলেন, বিদ্যাচর্চা এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অর্থ ঢেলে দিলেন। এইভাবে সকাল সন্ধ্যা শত কাজের মধ্যে দিয়ে কখন জীবন সূর্য অস্তাচলের পানে ঢলে পড়েছে খেয়াল ছিল না। শরীরের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকারটুকুও বেশ কমে গিয়েছে। তা হলেও মনকে জাগিয়ে রেখেছেন। চেতনাকে ঘুম পাড়াতে পারেননি।

১৮৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর, রবিবার। এক বিদেশিনী শিক্ষানুরাগী মিস মেরি কার্পেন্টার, বিলেত থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। একমাত্র উদ্দেশ্য, ভারতীয় স্ত্রী লোকেদের লেখাপড়া শিখিয়ে নতুন দিনের আলো দেখাবেন। ব্রিস্টেলে এর পিতা পাদরি কারপেন্টার সাহেবের বাড়িতে রাজা রামমোহনের মৃত্যু হয়। পদ্মপাতায় জল যেমন। কোথাকার মানুষ কোথায় এসে মারা গেলেন। শুধু শ্মশান বন্ধুর অধিকারটুকু দিয়ে গিয়েছিলেন রামমোহন। সেই সূত্র ধরে কলকাতায় এসে মিস মেরি কার্পেন্টার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে উত্তরপাড়ায় বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাত্রা করলেন। সেই সময়ের শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা অ্যাটকিনসন সাহেব এবং স্কুল ইন্সপেক্টর উড্রোসাহেবও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যে বিদ্যালয় পরিদর্শন করে ফেরার পথ ধরলেন। কিন্তু ওদের পিছু পিছু আর একজন। সে কেবল কাছে ডাকে। বালি স্টেশনের কাছে এসে বিদ্যাসাগরের গাড়ি হঠাৎ উল্টে গিয়ে ধাক্কা মারে এক গাছের গুঁড়িতে। হতচকিত হয়ে ছিটকে পড়ে প্রচণ্ড আঘাতে বিদ্যাসাগর সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তাঁর যকৃতে দারুণ চোট লেগেছিল। মিস কার্পেন্টার হাহাকার শব্দে তৎক্ষণাৎ বিদ্যাসাগরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অস্থিরভাবে চারপাশে দেখলেন। চারদিক থেকে লোক ছুটে এসেছে। মিস কার্পেন্টার পথের মধ্যে বসে বুকের কাছে বিদ্যাসাগরকে টেনে নিলেন। আহত এক পরোপকারী ব্যক্তিকে কোমল পরশ দিয়ে সংগোপনে অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলেয়ে দিলেন। নিজের রুমাল ভিজিয়ে ক্ষতস্থান ধুয়ে মুছে সমবেদনায় হৃদয় ঢেলে দিলেন। বিদ্যাসাগর আচ্ছন্নতার মধ্যেও চোখ দুটি মেলে একবার দেখে আবার ডুবে গেলেন অন্ধকারে। অনেক কষ্টে কলকাতায় কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতে নিয়ে এসে ডা: মহেন্দ্রলাল সরকারকে খবর দেওয়া হলো। যথাসময়ে রোগী দেখে ডাক্তারবাবু বললেন, বিদ্যাসাগরের লিভারে প্রচণ্ড চোট লেগেছে এবং রক্তক্ষরণ হয়েছে।

দুর্ঘটনার খবর শুনে হিতৈষী বন্ধুবান্ধবেরা ছুটে তাঁকে দেখতে এলেন। সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে চেনা-অচেনা মানুষের ভিড়ে ভরে গেল। দীর্ঘদিনের চিকিৎসায় কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু যে মারণ রোগে জীবন থেকে বিদায় নিয়ে চিরতরে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন, সেই কালধ্বনি পিছু নিয়ে এসেছে এই ঘটনা থেকেই। বলতে গেলে এখান থেকেই মৃত্যুবীজ নিশ্চিন্তে বাসা বেঁধে ছিল শরীরের মধ্যে। ভীমবলে বলীয়ান হয়ে যিনি এগিয়ে যেতেন অসহায় মানুষের দুঃখ মোচনে তাঁর শরীরের সমস্ত রোশনি নিভতে শুরু করল। প্রায় সময়ে মাথা ব্যথা। বদ হজম, পেটের রোগ। খাদ্যে অরুচি নানা উপসর্গ। সমস্ত রকম অসুস্থতাকে ছাপিয়ে একদিন উঠে দাঁড়ালেন বিছানা থেকে। ভীমবলে বলীয়ান বিদ্যাসাগর এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে হাওয়া বদলের তাগিদে ফরাসডাঙ্গা, বর্ধমান কানপুর নানা জায়গায় ঘুরে ফিরে এলেন সেই কলকাতায়। যেখানে হৃদয় বাঁধা পড়ে আছে তিলত্তমার প্রেমে।

১২৮৪ সাল বা ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্বশেষ কন্যা শরৎকুমারীর বিয়ের ব্যবস্থা হয়। পাত্র কার্তিক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নারায়ণশিলা সাক্ষী রেখে হোমযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিয়ের পরে মেয়ে-জামাই বাদুড়বাগানের বাড়িতেই থাকতেন।

শরীর যে আর কর্মক্ষমতা ধারণে অক্ষম বুঝতে পেরেছেন। মাতৃশোক, পিতৃশোক, প্রিয় জামাতার শেষ যাত্রা, প্রিয়তমা পত্নী দীনময়ীর দিন শেষ— একের পর এক মৃত্যু মিছিল দেখে দুর্বার তেজস্বী পুরুষ শোণিতশূন্য চলচ্ছক্তিহীন হয়ে নিঃসঙ্গতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। আসন্ন গোধূলির বিষণ্ণতা কেমন দিনের আলো নিভিয়ে দিতে শুরু করেছে হয়তো উপলব্ধি করেছেন। ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দুয়ারে দাঁড়িয়ে যে মহালগ্ন ফেরাবে কেমনে। শেষ মুহূর্তে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সলজার সাহেব রোগশয্যায় বিদ্যাসাগরকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। গভীর শোকচ্ছায়ায় স্তব্ধতা নেমে এলো। ২৯ জুলাই ১৮৯১, রাত্রি এগারোটার পরে করুণার সাগর বিদ্যাসাগরের জীবননাট্যের যবনিকা নেমে এলো। ▮

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

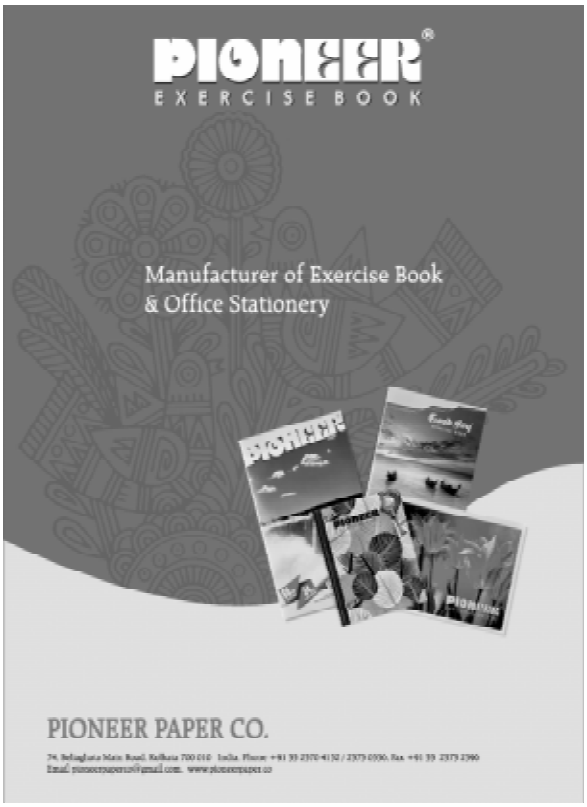

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫